ছোট্ট ছোট্ট গল্প



পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ছোট্ট ছোট্ট গল্প

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ছোট্ট ছোট্ট গল্প

ছবি সত্যজিৎ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮১
প্রথম আনন্দ সংস্করণ, বইমেলা ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সত্যজিৎ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১৫·০০ টাকা

খোকাখুকু আর তাদের খেলার
সাথী কুকুর, বেড়াল, হাঁস,
মুরগী, টিয়া এমন কি হরিণ,
কাঠবিড়ালী, ব্যাঙ ও ইঁদুরছানার
সুখ দুঃখের মধুর, করুণ ও মজার
এই ছোট্ট ছোট্ট গল্পগুলি
বৈশাখ ১৩৭৪ থেকে আশ্বিন ১৩৮১র
মধ্যে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
যারা সবে পড়তে শিখেছে তারাও
এই সহজ, সরস কাহিনীগুলি পড়তে
পারবে, গল্পের রসে মশগুল
হয়ে ভাল করে পড়তে শিখে যাবে।
লেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তী
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা
এবং সুকুমার রায়ের সহোদরা।

ইন্দ্রনীল ও তিমা-কে

ছোট্ট দাদা 'ইন্দ্রনীল' মাণিক জ্বলে উজল চোখে যার,
হাসিখুসি 'তিমা'রানি মিষ্টি মধুর ছোট্ট বোনটি তার,
খেলাধুলা নাচেগানে ছোট্ট প্রাণের খুসির আলো ঝরে
ঘরটি আলো করে আছ, আরও অনেক আছ কত ঘরে।
ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, শুনবে যারা, পড়বে অল্পসল্প,
তোমাদেরি ছোট্ট হাতে দিলাম আমার ছোট্ট ছোট্ট গল্প,
পেয়ে যদি খুসি হও, চাঁদমুখেতে ফোটে মধুর হাসি
তা'হলেই সুখী হব—সেই তো আমি দেখতে ভালবাসি।

—'বম্মা' (বড়মা)

সূচিপত্র



আদুরে খুকু

খুকু অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে আছে। মা কেন ওকে ফেলে দাদুর বাড়ি চলে গেলেন ? বললেন 'দাদুর অসুখ। তুমি সোনা-মেয়ে হয়ে পিসীমনির কাছে থেকো, আমি বিকালেই ফিরে আসবো।'

না, খুকু সোনামেয়ে হবে না। পিসীমনির কাছে থাকবে না। কোথায় চলে যাবে, কেউ খুঁজে পাবে না। মা কাঁদবেন বেশ!

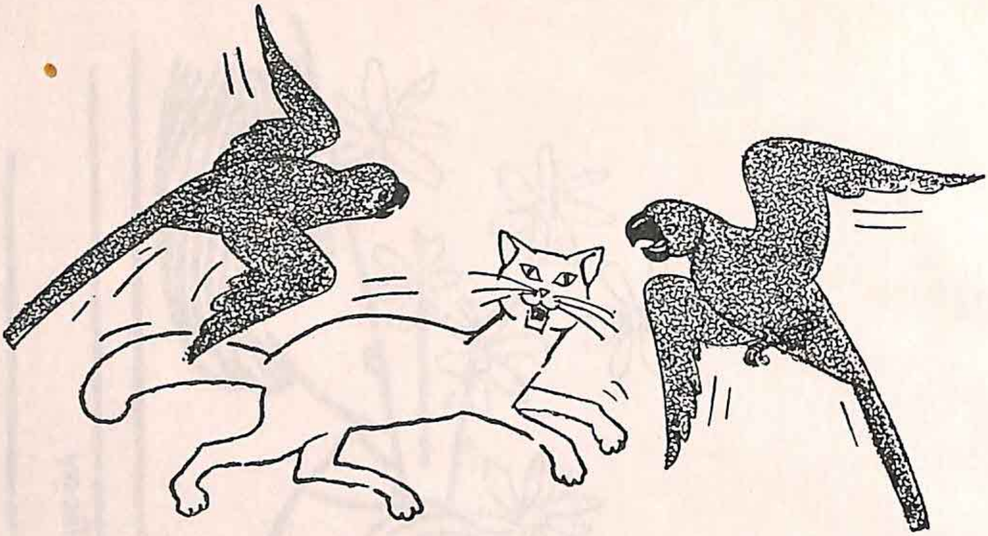
মা ফিরে এসে দেখলেন, খুকু নাই! কত ডাকলেন, খুকুর সাড়া নাই! পিসীমা বললেন 'এই তো ছিল, কোথায় গেল ? সারাদিন মেয়ের কী কান্না, কত বায়না, কিছুতেই ভোলানো যায় না!'

মা দেখলেন, দরজার পরদাটা নড়ছে—তার তলা দিয়ে ছোট্ট দুটি পা বেরিয়ে আছে। বললেন 'খুকুর জন্য ওর দিদা আমসত্ত্ব দিয়েছেন, মাসী চকোলেট দিয়েছে—'

এবার পরদাটা একটু ফাঁক করে একটা চোখ দেখা গেল।

'তা, খুকু তো বাড়ি নেই, ওগুলো আমরাই খেয়ে ফেলি ?'

হুস্ করে পরদা সরে গেল—ঝুপ্ করে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খুকু বলল 'কই মা চকোলেট ? আমসত্ত্ব কোথায় ?'



সুখী আর দুঃখী

দুটো টিয়াপাখির ছানা—বাসা থেকে পড়ে গিয়ে একটার খুব লেগেছে। বীণা গাছতলা থেকে তাদের তুলে আনল। নিজে খেতে পারে না, বীণার মা জল দিয়ে ছাতু মেখে, ছোট্ট ছোট্ট গুলি পাকিয়ে, তাদের হাঁ করিয়ে খাইয়ে দিলেন।

এখন ছানারা বড় হয়েছে—কথা বলতে, শিষ দিতে শিখেছে। একটা মোটাসোটা, তার নাম সুখী। অন্যটা রোগা, কানা, ডানা-ভাঙা—তার নাম দুঃখী।

সকাল হলেই তারা ডাকে—'বীনু-মা, ও-ও-ও বীনু-মা!' অমনি বীণা ছোলা নিয়ে ছুটে যায়। দাঁড়ে বসে দুই পাখি ভিজা-ছোলা খুঁটে খায়, বীণার ভারি ভাল লাগে দেখতে!

পাশের বাড়ির হল্‌দে বেড়ালটাও রোজ তাকিয়ে দেখে, আর ভাবে 'একবার ধরতে পারলে হয়।' নাম তার 'সোনালী।'

একদিন সোনালী বীনুদের বাড়িতে এসে এক লাফে দুঃখীর লেজ ধরে ফেলল! অমনি সুখী দাঁড় থেকে ঝুলে পড়ে তার কান কামড়িয়ে ধরল—'ক্যাঁ-ক্যাঁ, ঝট্-পট্, ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্, ম্যাও-ম্যাও'—বিষম ব্যাপার!

পট্‌পট্ পালক ছিঁড়ল, ঝর্‌ঝর্ রক্ত ঝরল, পালক মুখে নিয়ে সোনালী পালাল—তার কানের ডগাটা সুখীর মুখে রয়ে গেল!!

সাদির ম্যাজিক



রানু মিনু দুইবোন বাগানে গাছতলায় খেলা করছিল, একটা চিল এসে গাছের ডালে বসল। চিলটা কিসের যেন ছানা ধরে এনেছে, সেটা চিঁ চিঁ করে কাঁদছে!

রানু মিনু ডাকল 'ও মালী, দৌড়ে এস, মারো চিলটাকে।' মালী বাঁশ নিয়ে তেড়ে এল। চিল ভয় পেয়ে উড়ে গেল। ছানাটা মাটিতে পড়ে গেল।

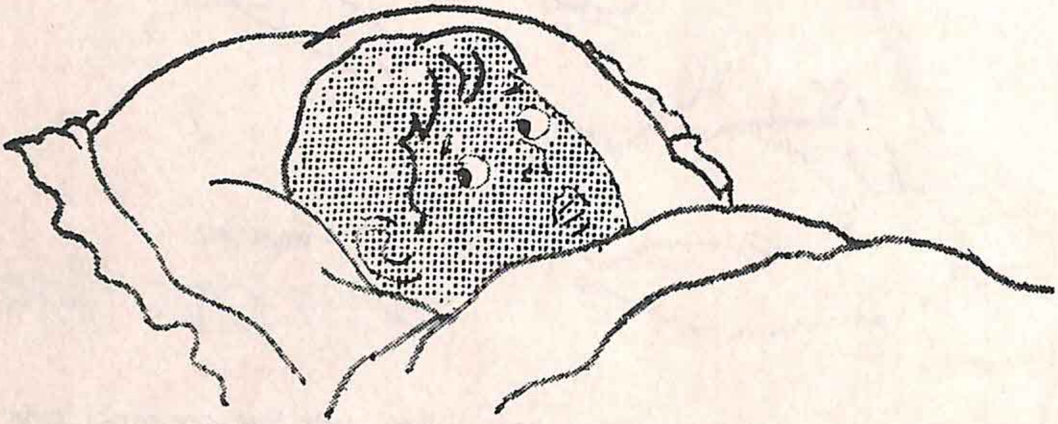
নরম তুলতুলে, সাদা ধবধবে, মুরগীর ছানা। ওরা তাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল। নাম রাখল সাদি। সাদির গায় চিলের নখ লেগে কেটে গিয়েছে। মা ওষুধ দিলেন। ঘা সেরে গেল। রোজ রানু-মিনুর হাতে খাবার খেয়ে সাদি বেশ বড় হয়ে উঠল।

হঠাৎ একদিন সাদি কোথায় হারিয়ে গেল। রানু-মিনু খাবার নিয়ে কত ডাকল, সাদি এল না। সারাদিন কত খুঁজল, সাদিকে পেল না। কেঁদে কেঁদে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে মালী গরুকে খড় খেতে দেবে বলে যেই না খড়ের গাদায় হাত দিয়েছে, অমনি 'কঁ-অ-ক্' করে কে যেন তার হাতে ঠুকরে দিল। 'আরে! আরে! সাদি যে এইখানে লুকিয়ে রয়েছে।' রানু-মিনু তখনই ছুটে এল।

খড়ের ভিতর বসে সাদি খালি বলছে—'কঁক্-কঁক্ কঁ-অ-কর-কঁক্ !!' (দ্যাখ্, দ্যাখ্ ম্যাজিক দ্যাখ্)! রানু যেই দুহাতে সাদিকে তুলে ধরল,—অমনি মিনু বলল 'ও-দিদি ডিম! সাদি ডিম দিয়েছে!' সেই থেকে সাদি রোজ একটা ডিম দেয়, একদিন রানু একদিন মিনু খায়।

ভীতু নিতু



রাতদুপুরে নিতুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই, জানালা দিয়ে ঝল্‌মলে চাঁদ দেখতে পেল।

ওরে বাবা! জানালার কোণে ওটা কি? ঐ যে গোল, কালো, কিসের মাথা—চোর নাকি? না,ওর দাদা তো বলেছে চোর ওখানে উঠতেই পারে না। তবে? তবে কি ভূত?

ভয়ে নিতু চিৎকার করতে গেল—গলা দিয়ে বিশ্রী একটা আওয়াজ বেরোল। দাদা সতু পাশেই শুয়েছিল, চম্‌কে উঠে বলল,'কি হল রে?' বাবা মা ছুটে এলেন, 'কি হ'ল নিতু?'

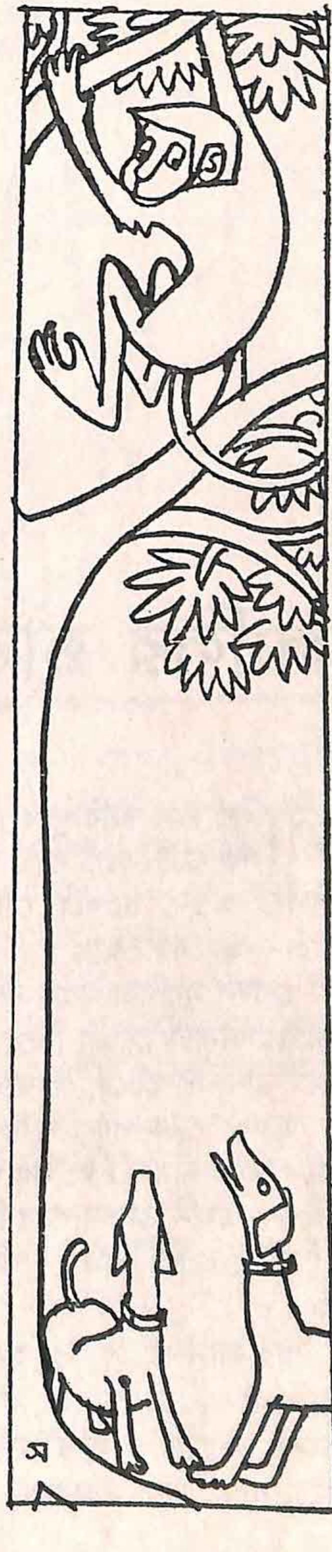
নিতু মাকে জড়িয়ে ধ'রে জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভূ-ভূ-ভূ-ত।' সতু লাঠি নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখি কেমন ভূত?'

ভূতটা মিহিসুরে বলল 'মিউ!' তারপর লাফিয়ে নেমেই, লেজ তুলে দে-ছুট!

ভূত নয়, চোর নয়, কারো মাথা নয়, পাশের বাড়ির সেই কালো বেড়ালটা গুটিসুটি জানালায় বসেছিল!

তখন সকলের কি হাসির ধুম! বেচারা নিতু লজ্জায় লেপের তলায় লুকিয়ে রইল।

আমচোর



বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।
একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর "রাজা" আর "রাণী" তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট করে আম গাছে উঠে গেল ; কুকুর তো গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নিচে থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে,উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে !

ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মত ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচিরমিচির করছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুররাও ভাবছে, 'যাবে কোথায় বাছাধন ? এক সময়ে তো নামতেই হবে ?' তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রাণী এক সাথে এক পাতে খায় ; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রাণী বসে পাহারা দিল, তারপর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রাণী খেয়ে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রাণীকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হল। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল !



লালির ছানা

লালির মনে ভারি দুঃখ। অন্য মুরগিদের অনেক ছানা হয়েছে : কেমন গোল গড়ন, সরু ঠোঁট, ছোট ছোট পায়ে তুরতুর করে ছোটে। লালির মোটে একটা ছানা, তাও ধ্যাবড়া গড়ন, চ্যাপটা ঠোঁট, থ্যাবড়া পায়ে ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে, সবাই হাসে, বলে—'ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ।'

সেদিন মুরগিরা সবাই বাইরে বেড়াতে গেল। সব ছানারা ঘাসে খেলা করছে, আর লালির ছানাটা সোজা গিয়ে পুকুরে নামল। লালি কত চেঁচাল, সে ফিরেও চাইল না, কচি ডানা ঝাপটিয়ে, থ্যাবড়া পায়ে জল ছিটিয়ে মনের আনন্দে স্নান করতে লাগল!

হঠাৎ 'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!'—পাশের বাড়ি থেকে একপাল ছানা নিয়ে দুটো হাঁস এসে জলে নামল। লালির ছানাও অমনি 'প্যাঁক-প্যাঁক' করে, সাঁতার কেটে চলল সেই দিকে—এমনি তাদের দলে মিশে গেল যে লালি চিনতেই পারল না কোনটা তার ছানা!

সাদি, কালি, লালি, হলদি, সবাই অবাক হয়ে বলল—'কঁক-কঁক-কঁক? এর মানে কি?'

এর মানে যে কি, তা শুধু ভজুয়া জানে। ভজুয়া দুই বাড়িতেই কাজ করে। সাদি, কালি বসে ডিমে তা দেয়, লালির ডিম নেই, তবু সে ওদের দেখাদেখি বসে থাকে, তাই ভজুয়া চুপিচুপি ও-বাড়ি থেকে একটা হাঁসের ডিম এনে লালির ঝুড়িতে রেখেছিল। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরোল, লালি ভাবল ওটা তারই ছানা!

সেই লোকটা



সেই লোকটাকে দেখলেই খোকনের ভয় হয়—বেঁটে, মোটা, কালো, ঝাঁকড়া-মাথা, পিঠে মস্ত একটা থলে। আয়া বলেছে, 'লোকটা ছেলেধরা। একলা বাইরে গেলেই, ধরে ঝুলিতে পুরবে!' তাইতো খোকন কখনো একলা রাস্তায় বেরোয় না।

একদিন সে ভুলে বাঁদর-নাচ-ওয়ালার পিছনে অনেক দূর চলে গেল। বাড়ি ফিরতে গিয়ে আর পথ চিনতে পারে না! ভ্যাঁ—করে সে কেঁদে ফেলল।

হেঁড়েগলায় কে বলল 'কি হ'ল খোকাবাবু?' চেয়ে দেখে, ওরে বাবা! সেই লোকটা! 'মা-মা' বলে খোকন ছুটল, লোকটা খপ করে তাকে ধরে কাঁধে তুলে বলল, 'ভয় কি? এখনি মার কাছে যাবে, কোথায় বাড়ি তোমার?' কোথায়, তা জানে না বলেই তো খোকন কাঁদছে!

ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ তারা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িতে তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে খোকনকে খুঁজছে!

বাবা বকশিস দিতেই, লোকটা একগাল হেসে সেলাম করল, তারপর আবার থলি কাঁধে চলল—'শি—শি বো—ত—ল্!'

খোকন চুপি চুপি মাকে বলল, 'মা, তবে যে আয়া বলেছিল,—লোকটা ছেলেধরা?'

'না, বাবা, লোকটি খুব ভাল। কিন্তু, যদি সত্যিই ছেলে-ধরা হ'ত, তাহলে আজ কি হ'ত, বল তো খোকন?'

ব্যাঙের নৌকো

নদীর ধারে ব্যাঙের বাসা। কত নৌকো এসে ঘাটে লাগে, কত লোক আসে যায়—দেখে দেখে, ছোট্ট ব্যাঙের ছানার সাধ হ'ল নৌকো চড়তে।

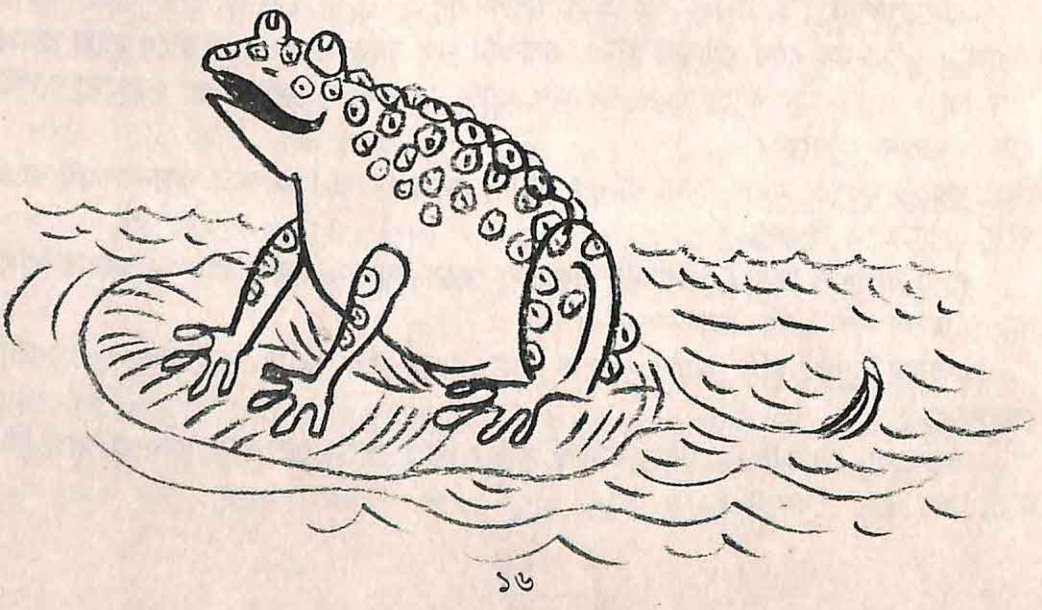
অনেক কষ্টে ছানাটা একটা নৌকোতে চড়ল, অমনি মাঝি তাকে ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল! মনের দুঃখে বেচারা বলল—'ছোট্ট একটি নাও যদি গো পাইতাম,
নিজেই তারে বাইয়া চইল্যা যাইতাম!'

হঠাৎ জোরে হাওয়া বইল, ঘাটের পাশের বটগাছ থেকে শুখ্‌নো পাতা টুপটাপ্ ঝরে পড়ল। পাতাগুলো জলে পড়ে ভাসছে—ঠিক যেন ছোট্ট ছোট্ট নৌকোর মতন! দেখেই ব্যাঙের ছানা ডেকে উঠল 'নাও? নাও? নাও?'

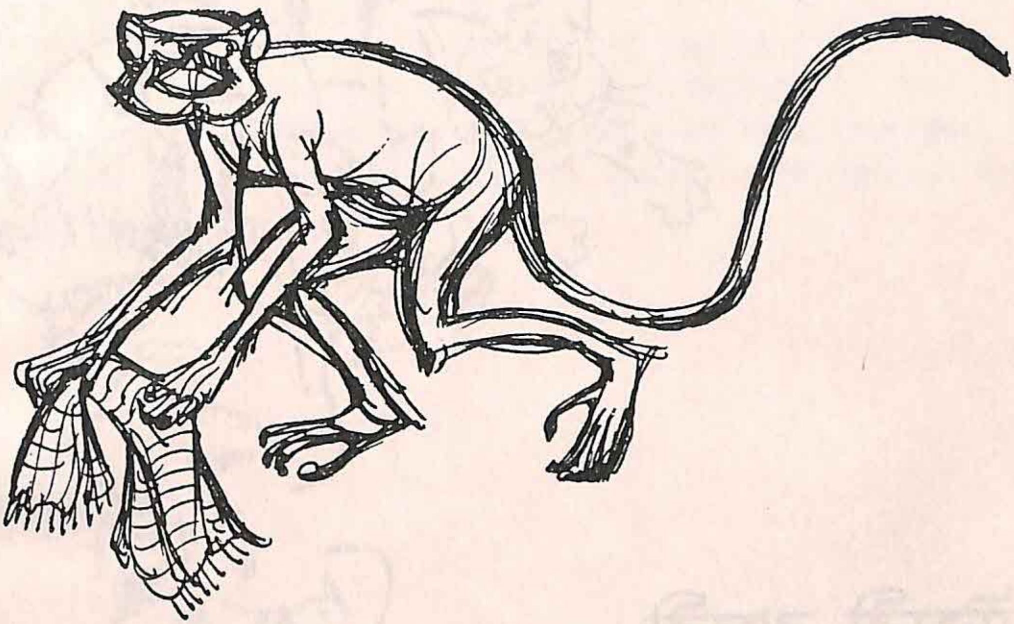
অমনি তার বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদু-দিদা, সবাই ছুটে এল—'বাঃ! কি সুন্দর নাও!' বলে, এক একজন এক একটা পাতায় চড়ে বসল।

ঘাসের দাঁড় দিয়ে পাতার নৌকো বেয়ে, মনের আনন্দে গান গেয়ে, তারা ভেসে চলল—

(ছানারা) 'আমার এক নাও, তোমার এক নাও;
দাদার এক নাও, দিদির এক নাও;
বাবার এক নাও, মায়ের এক নাও;
দাদুর এক নাও, দুদুর এক নাও;
জন জন নাও—'
(সকলে) 'নাও-নাও-নাও-নাও-নাও।'



হনূ



দুপুরে ডালে বসে হনূ ভাবছে, 'সকালে গাছভরা পেয়ারা দেখলাম, একদম খালি ! হিংসুটে মালীটা বুঝি সব পেড়ে নিয়েছে ?'

পাশেই মালীর ঘর । উঁকি মেরে হনূ দেখল মালী বৌ ঘুমিয়ে আছে । চুপি চুপি ঘরে ঢুকে, সে এদিক ওদিক তাকাল । মালীর কচি ছেলেটা মায়ের পাশে শুয়ে আপন মনে হাত পা নেড়ে খেলছে আর হাসছে । হনূর ভারি মজা লাগল, সে খোকাকে কাতুকুতু দিল । দিতেই, ছেলেটা 'প্যাঁ—' করল । অমনি মালী বৌ ধড়মড়িয়ে উঠে, ছেলেকে ধরে হাঁউমাউ জুড়ে দিল !

হনূ কিচির মিচির করে বলল,'আরে বাপু ! ছানাটাকে একটু আদর করেছি তাতেই চেঁচামেচি কিসের ?'

মালী বৌ আবার চেঁচাল—'দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আস্‌চে গো—'

দুম্ দুম্ করে মালী ছুটে এল । তড়াক্ করে হনূ জানলায় উঠল । একটা লাল গামছা জানলায় ঝুলছিল, সেটাকে বগলে নিয়ে সে তর্‌তর্ করে গাছে চড়ল । তারপর, মালীকে একটা ভেংচি কেটে, 'হুপ' করে লাফ দিল পাশের বাড়ির আমগাছে ।

মালী বলল,'মুখপোড়া নতুন গামছাটা নিয়ে পালাল !' খোকাকে চুমু খেয়ে মালী বৌ বলল, 'আমার যাদু সোনাকে যে নিয়ে পালায়নি, সেই আমাদের ভাগ্যি ।'



উমরী-ঝুমরী

ছোট্ট বাগান বাড়িতে একলা মানুষটি থাকেন। সবাই তাঁকে ভালবাসে, সবাই ডাকে মাসিমা।

শেষরাতে মাসিমা জেগে উঠলেন—'বাগানে কাদের খোকা কাঁদছে ?'

মালিকে ডেকে খুঁজে দেখলেন, দুটো বেড়ালছানা গাছের তলায় পড়ে কাঁদছে—'ওঁয়া ! ওঁয়া !' এখনো চোখ ফোটেনি, কিন্তু দু-তিনমাস বয়সের ছানার মতন বড়। মালী বলল—'বনবেড়ালের বাচ্চা !'

মাসিমা ওদের ঘরে এনে পুষলেন। নাম রাখলেন 'উমরী' আর 'ঝুমরী'। খেয়েদেয়ে ওরা বেশ মস্ত হয়ে উঠল—সারা গায়ে কালো ডোরা কাটা, চোখ দুটো হলদে, ঠিক যেন বাঘের বাচ্চা !

মাসিমা এত খাওয়ান, তবু উমরী-ঝুমরী চুরি করে খায় ! ছোট্ট জালের আলমারিতে দুধ থাকে। উমরী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পা দিয়ে আলমারিটা ঝাঁকায়, দুধ ছলকে মাটিতে পড়ে। ঝুমরী চেটে খায়। আবার ঝুমরী আলমারি ঝাঁকায়, উমরী দুধ খায়।

সারাদিন ওরা পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। রাতে শহর ছাড়িয়ে শালবনে চলে যায়। আবার ভোরবেলায় বাড়ি ফিরে আসে। একদিন আর তারা ফিরল না।

মাসিমার ভারি দুঃখ। সবাই বলল—'দুঃখ করবেন না মাসিমা, ওরা ঐরকমই হয়!'

'বনের বেড়াল ঘরে এসে দুধু ভাতু খায়,
খেতে খেতে আড় নয়নে বনের পানে চায়!'

তবু মাসিমা ওদের জন্য দুঃখ করেন, রোজ ওদের খাবার রেখে দেন।

হঠাৎ একদিন সকালে যেই না দরজা খুলেছেন অমনি 'ম্যা—ও' বলে উমরী-ঝুমরী লাফিয়ে ঘরে ঢুকল !!

বেলুন

'কিঁচ, কিঁচ, কিররর-কিঁচ!'

শব্দ শুনে বাবলু ছুটে জানলার ধারে গেল।

একজন লোক এক ঝাঁক বেলুন নিয়ে চলেছে। একটা বেলুনের গায়ে হাত ঘষে ঘষে সে ঐ রকম শব্দ করছে—'কির্-র্-র্—কিঁচ্ কিঁচ!'

বাবলু নেচে উঠল—'মা, মা, বেলুন নেব! দাদা, বেলুন কিনবে চল! ও বেলুনওয়ালা এদিকে এস—এই যে এই বাড়ি!!'

কত রঙের, কত রকমের বেলুন! মা পয়সা দিলেন। বাবলু আর তার দাদা টুবলু, দুজনে দুটো বেলুন বেছে নিল। বাবলুরটা হলদে, পাখির মত দেখতে। টুবলুরটা নীল, সাপের মত দেখতে।

টুবলু বলল: 'কত বড় সাপ, দেখেছিস? এক কামড়েই তোর পাখিকে জব্দ করবে।'

বাবলু বলল: 'না, এ যে ঈগল পাখি, এ তো সাপ খায়।'

'ঈগল পাখি না হাতি! ওটা ভূতুম পেঁচা!'

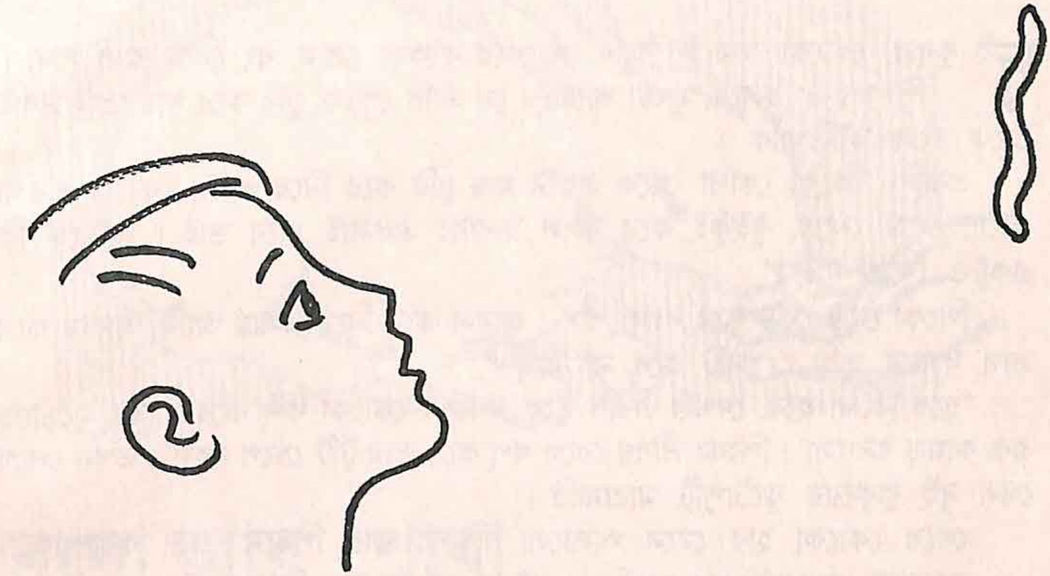
'পেঁচাও সাপ খায়,—বাবার বইয়ে ছবি দেখ নি?'

'আরে সে তো এইটুকুন একটা বাচ্চা সাপ! এটা হল আসল কেউটে। দেখবি কেমন তেজ?'

'ফোঁস' করে টুবলুর সাপ বাবলুর পাখিকে তেড়ে গেল।
'কঁ-অ'—করে বাবলুর পাখিও সাপকে মারতে এল।
'ফ-টা-স্' করে দারুণ জোরে একটা শব্দ হল।
'চটাস' করে চাঁটি লাগল টুবলুর হাতে আর বাবলুর গালে।
দুজনেই ভয়ানক চমকে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর দেখল যে নীল সাপ কুঁকড়িয়ে কেঁচোর মত ছোট সরু হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর হলদে পাখি যে ফেটে টুকরো-টুকরো হয়ে কোথায় উড়ে গেছে তার ঠিক নাই!
বাবলুর চোখে জল, গালটা লাল হয়ে গেছে।
টুবলু বলল—'মাকে বলে কাল তোকে আবার বেলুন কিনে দেব, কেমন?'
বাবলু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'চাই না! ছাই বেলুন! পচা বেলুন।'
'তবে কি নিবি বল? চকোলেট?'
ফিক করে হেসে, চোখ মুছে বাবলু বলল, 'চ-কো-লে-ট!'



খোকা আর পোকা



'ওলে বাবা ! কামলাবে !' বলে খোকন তার ছোট লাঠি দিয়ে পোকা মারতে গেল। সবুজ শুঁয়োপোকা।

রানু বলল—'মেরো না খোকন, ও কামড়ায় না।' শুঁয়োপোকা দেয়াল বেয়ে উঠে এক কোণে গিয়ে থামল। তারপর নড়াচড়া নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, সেখানেই সেঁটে রইল।

ওরা রোজ পোকাটাকে দেখে, তার গায়ে জালের মত কি যেন জড়ানো। মা বললেন যে শুঁয়োপোকা নিজেই জালটা বানিয়েছে, যেমন মাকড়সা বানায়। জালের মধ্যে কিছুদিন ঘুমোবে, তারপর একটা মজা হবে।

জালটা আরো ঘন আর গোল হল, পোকাটাকে আর দেখা যায় না!

হঠাৎ একদিন খোকন চেঁচিয়ে উঠল—'পোজাপুতি পোজাপুতি !'

রানু মিনু গিয়ে দেখল পোকাটা জাল থেকে বেরিয়েছে। এখন আর সে শুঁয়োপোকা নাই। চমৎকার প্রজাপতি হয়ে গেছে।

একটু পরে নীল ডানা মেলে সে বাইরে উড়ে গেল।

বাগানে অনেক ফুল, মধু খেতে নানা রঙের প্রজাপতি আসে।

নীল প্রজাপতি দেখলেই খোকন হাততালি দিয়ে বলে, 'ঐ যে আমাল পোজাপুতি।'

কোকো, পিংকা আর

দুই কুকুর, কোকো আর পিংকা। কোকোর ঝাঁক্‌ড়া লোম, রং মেটে আর সাদা। পিংকার রং হলদে, মুখটা কালো। সে ভারি পেটুক, চুরি করে খায়, তাই সবাই তাকে বলে 'হাঁড়িখাকি'।

একদিন পিংকা কোথা থেকে একটা মাছ চুরি করে নিয়ে এল। কোকো তার গা ঘেঁষে, লেজ নেড়ে, কুঁইকুঁই করে বলল, 'সবটাই একলাই খাবে ভাই ? কাউকে কি একটুও দিতে নাই ?'

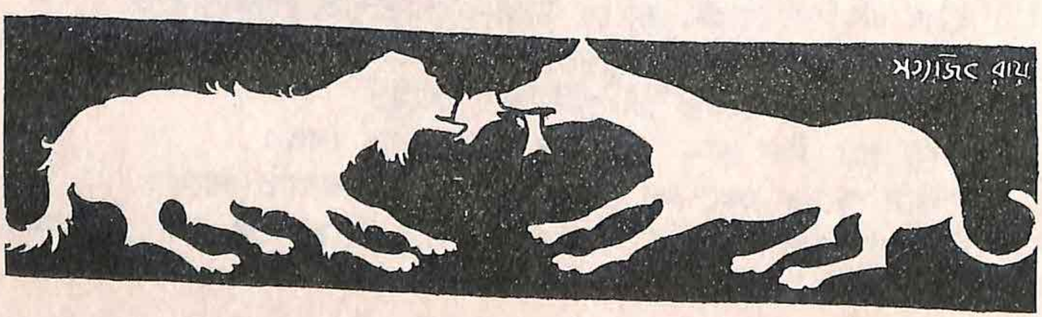
পিংকা ঘেউ ঘেউ করে বলল, 'ইস্! কায়দা করে নিয়ে এলাম আমি, আরাম করে ভাগ বসাবে তুমি ? সেটি হবে না বাপু।'

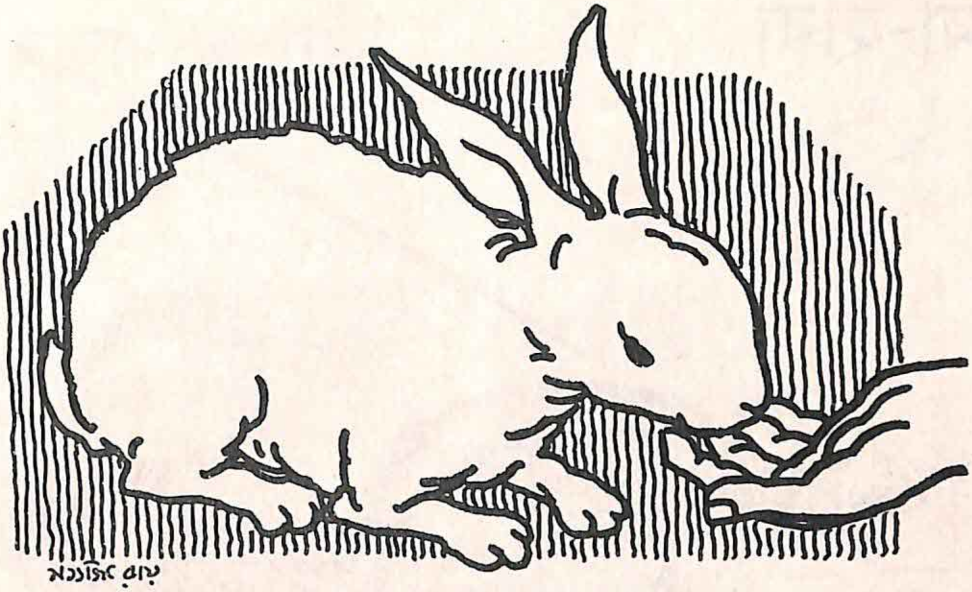
'হবে কি না হবে, দেখ্‌বি এবার তবে ?' বলে কোকো কপ্ করে মাছের মুড়োতে এক কামড় বসালো। পিংকা ভীষণ রেগে খপ্ করে তার টুঁটি চেপে ধরল। তখন লেগে গেল দুই কুকুরের ঝুটোপুটি মারামারি।

শেষে কোকো হার মেনে পালালো, পিংকা তার পিছনে তাড়া করল।

জানালায় বসে পুসি সব দেখছিল, যেই না কোকো আর পিংকা বাইরে গেল, অমনি সে একলাফে নেমে এসে ডাকল 'আয় লালি। আয় কালি। ভোজ খাবি আয়!' দুই ছানা লালি আর কালি তখনি মিউ মিউ করে ছুটে এল।

কোকোকে বাগানে তাড়িয়ে দিয়ে পিংকা ভাবল, এবার মজা করে বসে মাছটা খাই গিয়ে। এসে দেখে, ও মা, মাছ তো নাই। কোথায় গেল ? কোথায় গেল ? উপর দিকে তাকিয়ে দেখে, জানালার তাকে বসে পুসি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর আড়চোখে চেয়ে আছে।





বুনো আর পোষা

বাব্‌লুরা সকলে মোটরে অনেক দূর বেড়াতে চলেছে। পথে হেড্‌লাইটের আলোতে ওরা দেখল—লম্বা কান পিছনে করে, বেঁটে লেজ খাড়া করে, ছোট্ট ছোট্ট কারা সব দু'ধারে লাফিয়ে চলেছে।

বাবা বললেন 'ওগুলো খরগোস, ভয়ে পেয়ে ছুটছে!' কাকু বললেন 'মারবো নাকি? খাসা লাগে খেতে।' মা বললেন 'আহা! থাক! থাক, থাক!'

রাতে ওরা ডাক বাংলায় রইল। সকালে একজন লোক একটা খরগোস বেচতে আনল। টুব্‌লু বলল 'আমরা ওটাকে পুষবো।'

খরগোসকে খাবার দিয়ে, ঝাঁপির ভেতর রেখে ওরা বেড়াতে বেরোল। ফিরে এসে দেখে, খরগোস পালিয়েছে।

মা বললেন 'ওরা বুনো—পোষ মানে না। ছোটদার খরগোসের ছানা হয়েছে, তোমরা চেয়ে নিয়ো।'

ছোটমামা ওদের দুটো খরগোস দিলেন। ফুর্‌ফুরে সাদা, লাল চোখ, গলায় ঘুঙুর বাঁধা—লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আর ঝুন্‌ঝুন্ ঘুঙুর বাজে।

বাবলু টুব্‌লু ডাকলেই তারা ছুটে আসে। ওদের হাত থেকে ঘাস, ছোলা, শাক-পাতা খায়।

মা-হারা



বাগানে অনেক ফল গাছ। ফল খেতে কত পাখি আসে, কাঠবেড়ালও আসে। একদিন একটা ছানা কাঠবেড়াল ঘরের ভিতর চলে এল। রানু আর মিনু তোয়ালে চাপা দিয়ে তাকে ধরল। ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে ওরা তাকে রুটি, কলা, কিসমিস খেতে দিল। বলল—'ওকে আমরা পুষবো।'

বাইরে ছানার মা 'কিচির-কিচ-কিচির-কিচ' করে ছানাকে খুঁজছে। ছানাও ঘর থেকে বলছে, 'কিচ কিচ কিচ'; ডাক শুনে মা জানলার কাছে এল, দেখল ছানা রয়েছে। ভয়ে সে ঘরে ঢুকল না।

রানু বলল, 'চল আমরা বাইরে গিয়ে আড়াল থেকে দেখি ওরা কি করে।' তখন কাঠবেড়াল-মা ছানার কাছে ছুটে এল। পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে বসে, সামনের দুই পা দিয়ে ছানাকে তুলে নিল। তারপর কত আদর করল। ঠিক যেমন রানু মিনুর মা ওদের আদর করেন।

দেখে ওদের ভারি মায়া হল, ওরা দড়িটা খুলে দিল। মা আর ছানা নাচতে নাচতে চলে গেল।

রানু-মিনু বলল—'আবার এসো!'

কাল বৈশাখী



দুপুরে খেতে বসে বাসুর মা বলল,'ও বাসু, কাল কিন্তু তোর খেলতে যাওয়া হবে না ; কাল বাবুদের নাতির 'মুখে-ভাত', নানারকম রান্না করতে হবে—রান্না ভাল হ'লে গিন্নীমা ভালরকম বকশিস্ দেবেন বলেছেন, দুপুরে আমি তো বাড়ি আসতে পারবো না—তুই না থাকলে ফেলিকে দেখবে কে ?' কাল রবিবার ছুটির দিনেও খেলতে যাবে না শুনে বাসুর মনটা খারাপ লাগল, তবু কিছু বলল না—সে তো জানে, মা কত কষ্ট করে সারাদিন খেটে টাকা আনে। আগে তো তাদের এমন কষ্ট ছিল না, তখন বাসুর বাবা ছিল, চাকরি করতো প্রায় এক বছর আগে, ফেলির জন্মের ক'দিন পরেই হঠাৎ বাবা মারা গেল—সেই থেকেই যত দুঃখ কষ্ট !

ওদের বস্তির কাছেই কয়েকজন দিদিমণি মিলে নতুন একটা স্কুল খুলেছে, সেখানে রোজ দুপুরে পড়া হয়, তারপর গান, গল্প, ছড়া, ছবি, আরো কত কি—খু-উব ভাল লাগে ! বাসু ভাবে, সে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, ভাল করে কিছু কাজকর্ম শিখবে, তারপর বাবার মত চাকরি করবে—তখন ওদের কষ্ট ঘুচবে।

পরদিন মা আরো ভোরে কাজে চলে গেল ; বাসুকে বলে গেল, 'ফেলিকে একটু দেখিস বাবা ! কোথাও বেরোস নি ; দুটি পান্তা ভাত রইল এবেলা খেয়ে নিস্, ওবেলা ভাল ভাল খাবার আনবো, মজা করে খাবি।' সকালে ফেলি বেশ খেলা করল, দুপুরে

সে কিছুতেই ঘুমোবে না—মায়ের জন্য কান্না জুড়ে দিল ; শেষে বাসু রেগে তাকে এক থাপ্পড় মারল—সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে খেলার সাথীরা ডাকতে এল, ফেলি বেশ ঘুমোচ্ছে দেখে, বাসু পা টিপে টিপে বেরিয়ে খেলতে পালাল। ওদের সরু গলি থেকে বেরিয়েই আরেকটু চওড়া একটা গলি, সেখানে গাড়ি ঘোড়া চলে না, রাস্তার উপরেই ছেলেরা রোজ খেলতো ; এখন তো স্কুলে যায়, রবিবার খেলাটি জমে ভাল।

একটু পরেই ফেলির ঘুম ভাঙল ; কেউ নেই দেখে, সে 'ম্মা'— 'দাদ্দা'—বলে ডাকতে ডাকতে বাইরে এল ; বড় গলি দিয়ে ঠুং ঠুং করে একটা রিক্স চলছিল, 'গালি ! গালি !' বলে ফেলি সেটার পিছনে পিছনে একবারে বড় রাস্তায় চলে গেল—কেউ দেখতে পেল না। ওদিকে বাসু খেলায় মেতে ফেলির কথা ভুলেই গিয়েছিল, অনেক দেরীতে যেই খেয়াল হল অমনি বাড়ি ফিরল ; এসে দেখে ফেলি নেই— আশপাশের কারো ঘরে, গলিতে, কোথাও নেই। ভারি ভয় হল, 'বড় রাস্তায় চলে যায় নি তো ? সেখানে যে গাড়িঘোড়ার ভীষণ ভীড়।' দুতিন জন সাথীকে নিয়ে, তাড়াতাড়ি খুঁজতে বেরোল।

হঠাৎ ভীষণ জোরে ঝোড়ো হাওয়া বইল, আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, বৃষ্টি শুরু হল। বৈশাখ মাসে প্রায়ই এরকম ঝড় হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়—তাই একে বলে কাল বৈশাখী। দমাদম দরজা জানলা বন্ধ হল, সাথীরা সব বাড়ি পালাল, একলা বাসু চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর মনে মনে ভগবানকে ডাকছে 'ঠাকুর, ফেলিকে এনে দাও !' তার বুকের মধ্যেও তখন যেন ঝড় বইছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। খানিক পরে মনে হল 'হয়তো মা এর মধ্যে কোনো কাজে বাড়ি ফিরেছিল—ফেলিকে একলা দেখে তাকে নিয়ে গিয়েছে।' অমনি সে বাড়ির দিকে ছুটল।

খানিক আগে, দুই হাতে দুই পোঁটলা ঝুলিয়ে বাসুর মা হাসিমুখে বাড়ি ফিরছিল—কত ভাল ভাল খাবার এনেছে, বাসু খেয়ে কেমন খুসি হবে ! ফেলিও পায়েস খাবে, সন্দেশ খাবে। এসে দেখে ঘরে কেউ নেই। ভাবল, দুষ্টু ছেলেটা কথা না শুনে, এই গরমে ফেলিকে নিয়েই খেলতে বেরিয়েছে—এলে, খুব বকে দেব। ভারি ক্লান্ত হয়েছিল, একটু জিরোতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ গুড়্-গুড়্-গুড়্ শব্দে চমকিয়ে জেগে দেখল, 'কাল বৈশাখী' ঘনিয়ে এসেছে—বাসু-ফেলির দেখা নাই ! মহা ব্যস্ত হয়ে সে খুঁজতে বেরোল—পথেই বাসুর দেখা পেল। দুজনের ডাকাডাকিতে কেউ কেউ দরজা খুলল, সব শুনে বলল, 'থানায় খবর দাও'; দুজন পাড়ার ছেলে বলল, 'চল, তোমাদের নিয়ে যাই।'

থানায় পোঁছে, বাসুর মা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল ! বাসুরও পা কাঁপছে, কোনোমতে 'দাদাবাবু'দের হাত ধরে সামনের চেয়ারে বসা পুলিস অফিসারের কাছে এগিয়ে যেতেই, শুনতে পেল 'দা-দ্দা ! দা-দ্দা !'—দেখল পাশের চেয়ারে ফেলি বসে হাসছে ! ছুটে গিয়ে সে ফেলিকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বাসুর মাও ধড়মড়িয়ে উঠে এসে

দুজনকেই জড়িয়ে ধরে পাগলের মত হেসেকেঁদে আকুল হল ! খানিক পরে, শান্ত হয়ে সব কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারল—

বড় রাস্তায় এসে ফেলি তো একেবারে থ—লোকজন গাড়িঘোড়ার কি ভীষণ ভীড় ! চারদিকে কি বিষম বিকট শব্দ ! ভয়ে সে রাস্তার দিকে গেল না—মাকে, দাদাকে ডাকতে ডাকতে ফুটপাথে হামা দিয়ে চলল ; খানিক দূরে গিয়ে 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল ; পাশেই একটা পানের দোকান ; পানওয়ালা তাকে তুলে নিয়ে হাতে লজনচুষ্ দিল—চুষতে চুষতে ফেলি ঘুমিয়ে পড়ল । বিকালে 'কাল বৈশাখী' ঘনিয়ে এল তবু কেউ মেয়েটার খোঁজ করতে এল না দেখে, পানওয়ালা দোকান বন্ধ করে, থানায় গিয়ে ফেলিকে পুলিসের হাতে দিয়ে, বৃষ্টিতে আটকিয়ে সেখানেই বসে ছিল—তার মুখেই সব কথা শুনল ।

ফেলিকে কোলে নিয়ে, বাসুর হাত ধরে, মা বেরিয়ে এল—তিনজনের মুখে হাসি ধরে না ! বাইরে এসে দেখল—ঝড়বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মেঘ কেটে গিয়েছে—নির্মল আকাশে চকচকে চাঁদটাও তাদের দিকে চেয়ে হাসছে ।

হ্যাংলা

সকালে আমসত্ত্ব রোদে দিয়েছিলেন ঠাকুরমা, বিকালে তুলতে গিয়েই বলে উঠলেন, 'নাঃ কাগের জ্বালায় আর পারি না ! আধখানা আমসত্ত্ব ঠুক্‌রে খিম্‌চিয়ে নষ্ট করেছে !' ছোট্ট তপু বারান্দায় বসে চুপটি করে শুনছিল আর আড়চোখে চেয়ে দেখছিল ; যেই ঠাকুরমা নরম আমসত্ত্বটা চেঁছে তুলে ফেলে দিতে যাবেন অমনি সে ছুটে এল, 'ফেলো না ! ও ঠাকু-মা ওটা কাগে খায়নি—আমি খেয়েছি ।' ঠাকুরমা অবাক ! 'ওমা, এই তো দুপুরে একবাটি ঘন দুধ আম দিলাম, এরি মধ্যে আবার কাঁচা আমসত্ত্বটা খেয়ে বসলে ! কেন এমন কর দাদু ?' ঐ তো তপুর দোষ, ভাল খাবার দেখলে সে কিছুতেই লোভ সামলাতে পারে না ! যতই পেট ভরে খেতে দাও, আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে খাবে, অন্যদের ভাগ থেকেও খেয়ে নেবে—দাদা দিদিরা তাই ওর নাম রেখেছে 'হ্যাংলা' ।

তপুর কাকামণি জন্তুদের ডাক্তার ; সেদিন তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে দেখলেন, একটিন চকোলেট ঘরে রেখে গিয়েছিলেন, সেটা আধটিন হয়ে গেছে !



রাতে খেতে বসে কাকামণি বললেন, 'জানো মা, আমাদের হাসপাতালে এক মজার ব্যাপার ঘটেছে—একটা গরুর লেজ ট্রামের ধাক্কায় কেটে গিয়েছিল ; কাটা ঘা তো সারল, কিন্তু লেজ নেই, মশামাছি তাড়াতে না পেরে বেচারার ভারি কষ্ট ! রাশিয়ায় এক ডাক্তার টিক্‌টিকির লেজ থেকে এক আজব ওষুধ বানিয়েছেন—টিক্‌টিকির লেজ খসে গেলেই যেমন আবার গজায়, তেমনি এই ওষুধে সব জন্তুদেরই কাটা লেজ আবার গজায় ! সেই ওষুধ আনিয়ে খাইয়ে, গরুটার দিব্য নতুন লেজ হয়েছে । ওষুধটা কিন্তু খেতে বিচ্ছিরি, গরু গাধারা খেয়ে নেয়, বেড়াল কুকুর বাঁদর এরা খেতে চায় না—এদের জন্য তাই ওষুধ মেশানো চকোলেট তৈরি হয়েছে। সেদিন হাসপাতালে একটা লেজ-ছেঁড়া বাঁদর এসেছে, লেজের দুঃখে বেচারা ভারি মন-মরা হয়ে আছে । তার জন্য ঐ ওষুধ-চকোলেট আনিয়েছি, কাল থেকে খাওয়াবো ।'

রাতে সবাই ঘুমিয়েছে, খালি কাকামণি বসে বই পড়ছেন, চুপিচুপি তপু এসে বলল, 'আচ্ছা, কাকামণি, সেই যে লেজের ওষুধের কথা বলছিলে, সেটা যদি মানুষে খায়, তাহলে ?' 'তাহলে, তারও লেজ গজাবে।' 'ও কাকামণি, আমি যে খেলাম !' 'য়্যাঁ ! বলিস কিরে ! কি সর্বনাশ ! এত বলি তবু তোর হ্যাংলামো যায় না ! এখন বোঝ তার ঠ্যালা !' তপু কেঁদে বলল, 'লেজ না-গজাবার কোন ওষুধ কি নেই, কাকামণি ? তাহ'লে দাওনা শিগ্‌গির দাও ! আমি আর কখনো কোনোদিন অমন করবো না কাকামণি !'

এক চামচ কড়্‌-লিভার অয়েল আর নিমের আরক মিশিয়ে ঢক করে তপুর গলায় ঢেলে দিয়ে, কাকামণি বললেন, 'আর ভয় নাই—এবার ঘুমোও গিয়ে !' পেটের

নাড়িভুঁড়ি সব যেন উল্টে আসতে চায়, তবু কোনমতে ওষুধটা গিলে, তপু চলে গেল। ঘুম হল না, বারবার হাত বুলিয়ে দেখল—লেজ গজায়নি ! তার কদিন পরে ভরসা হল যে, 'আর ভয় নাই !'

আরেকটু বড় হয়েই কিন্তু তপু কাকামণির চালাকিটা বুঝতে পারল—লেজের ওষুধ-টষুধ সব বাজে কথা, আসলে, ওটা ছিল হ্যাংলামির ওষুধ। যাই হোক, ওষুধটা কিন্তু ঠিক ধরেছিল—সেই থেকেই তপুর হ্যাংলামি-রোগ একেবারেই সেরে গিয়েছিল।

আষাঢ়ে

বাইরে সারাদিন ধরে ঝমাঝম বৃষ্টি—ঘরের মধ্যে এ পাশে জিতু, ও পাশে মিঠু, মাঝখানে দাদু। দাদু বললেন, 'গল্প বলতে হবে ? আচ্ছা, শোনো—সে অনেকদিনের কথা, কলেজে পড়ি, হস্টেলে থাকি, হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল শনিবারেতে মামাবাড়িতে ঘুরে আসি।

'মিছাপুর থেকে মামাবাড়ি ভুলনগাঁও পাঁচ মাইল দূরে ; রাস্তা ভালই, ফুটফুটে জোছনা, ফুরফুরে বাতাস, মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি আর পথ নাই—চারদিকে কাঁটাবন ! সামনে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি—দরজায় তালা লাগানো, বারান্দার এককোণে একটা পিদীম মিট মিট করছে, দেয়ালে একটা টিকটিকি পোকা খাচ্ছে, আরেক কোণে একটা হলদে বেড়াল ছানা ঘুমিয়ে আছে। একটু জিরিয়ে নিই বলে সেখানে বসলাম।

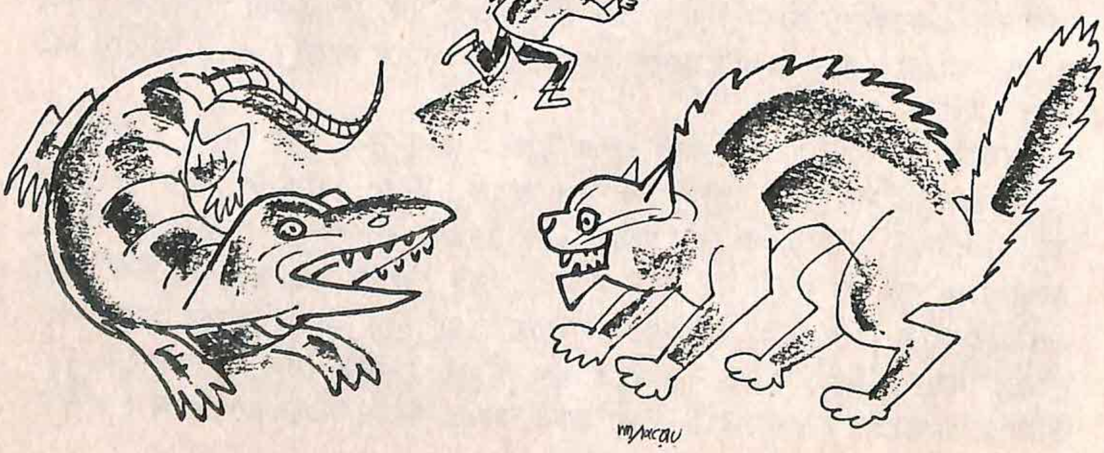
'হঠাৎ পিদীমটা দপদপ করে জ্বলে উঠল—অ-দ্-ভু-ত নীল আলো ! দেখলাম, মেঝেতে ছোট্ট সরু দুটো পোকা কিলবিল করছে। উপর থেকে টপ্ করে একফোঁটা কালো, আঁসটে, চটচটে কি যেন পড়ল, এক নিমেষে পোকাদুটো সেটা খেয়ে নিল। দেখতে দেখতে পোকাদুটি বড় হতে লাগল ; যেই কেঁচোর মত বড় হল, টিকটিকিটা একটাকে মুখে করে নিল, আরেকটাকে বেড়ালছানা ধরে নিল। নিজের সমান লম্বা কেঁচো গিলতে টিকটিকিটাও বড় হতে শুরু করল, দেখতে দেখতে গিরগিটির মত, তারপর গোসাপের মত বড় হয়ে 'খঁকর খঁকর' করতে করতে বাইরে চলে গেল ! ওদিকে

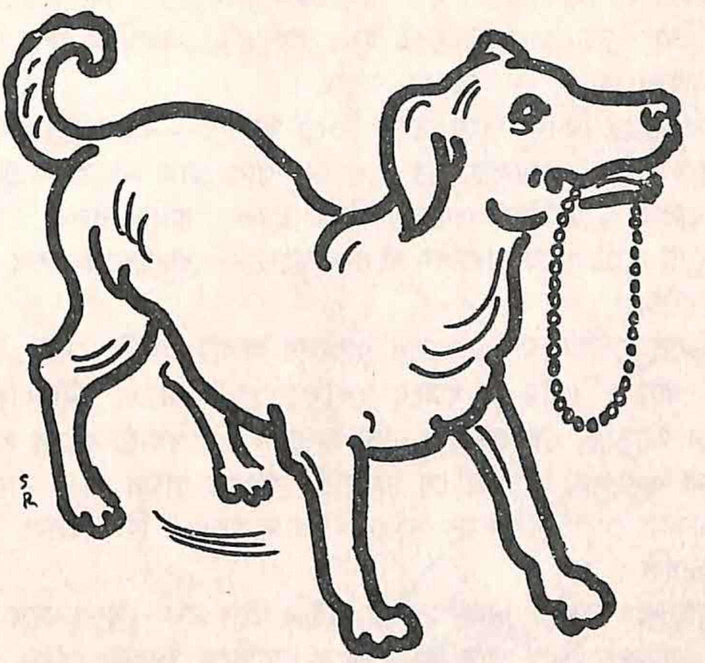
চেয়ে দেখি বেড়ালছানা আর ছানা নেই, মস্ত হলদে হুলো হয়েছে ! বেলুনের মত ফুলে ফুলে যেই না বাছুরের মত বড় হল অমনি আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে কাঁটাবনের মধ্যে দিয়েই ছুটলাম।

'সামনে একটা নদী, টিকটিকিটা এখন কুমীরের মত বড় হয়ে সেই দিকে চলেছে, পিছনে চেয়ে দেখি বাঘ ! বেড়ালটা ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ হয়ে এদিকে আসছে ! পাশেই একটা বড় গাছ দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম—ডাঙায় বাঘ,জলে কুমীর। সে যে কি ভীষণ লড়াই বাধল দুটোতে ! দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত পা ছেড়ে ধপ করে নিচে পড়ে গেলাম।

'খানিক পরে অনেক লোকের চেঁচামেচিতে হুঁস হল—'ও বাবু, কি হ'ল বাবু ?' একটু সামলিয়ে নিয়ে সব কথা ওদের বললাম ; ওরা বলে উঠল 'বাবা, রাম, রাম ! বাবু পথ ভুলে ঐ হানাবাড়িতে চলে গেছলেন ? রাম, রাম, রাম ?' ওরাই ডুলী করে আমাকে মামাবাড়ি পৌঁছে দিল। মামারাও বললেন, ওটা নাকি ভূতের বাড়ি, কেউ ওদিকে যায় না।'

জিতু মিঠু চোখ গোল করে মুখ হাঁ করে শুনছিল, এবার আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, 'দাদু, এসব কি সত্যি কথা ?' দাদু হেসে বললেন, 'নারে দাদু, এক্কেবারে মিথ্যে, বাজে কথা। বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ের লোক তো রাতে বেরোতে পারে না, ঘরে বসেই আড্ডা জমায়, গল্প করে, যত সব আজগুবি, গাঁজাখুরি, ভূতুড়ে গল্প এসময়ে জমে ভাল। আষাঢ় মাসে প্রথম বর্ষা নামে, সে সময়ে এই সব গল্প ভাল লাগে বলে এ রকম গল্পের নাম হয়েছে আষাঢ়ে গল্প। এটা তো আষাঢ় মাস, তাই তোমাদেরও একটা আষাঢ়ে গল্প বললাম। কেমন লাগলো বল তো ?'





টাইনি

ছোট্ট রোগা কুকুরটাকে উঠোনের দরজায় দেখেই মোতির মা ঝাঁটা মারতে গিয়েছিল, বিজু আর বাব্‌লি তাকে মানা করল। কপালটা কাটা, একচোখ কানা, এক ঠ্যাং খোঁড়া—এমন করে কে মারল বেচারাকে ? মোতির মা বলল 'কার বাড়িতে হাঁড়ি খেয়েছিল, দিয়েছে তারা ঠেঙিয়ে !' একটু দুধ দিতেই চেটেপুটে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কুকুরটা, সেই থেকে ও এখানেই রয়ে গেল।

মা ওকে স্নান করিয়ে, ওষুধ দিয়ে, পায়ে পট্টি বেঁধে দিলেন। ক'দিনেই চোখটা খুলল,কাটা ঘা শুকোল, মচকানো পাটাও সেরে গেল—এখন বেশ খেলা করে। কোনো জিনিস ছুঁড়ে দিলে ছুটে গিয়ে মুখে করে নিয়ে আসে। পেট ভরে খেতে পেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়েছে, তবে বাবা বললেন ও আর বড় হবে না—ঐরকম ছোট্ট জাতেরই কুকুর। ওর নাম রাখা হল 'টাইনি' (ছোট্ট) ; মোতির মা কিন্তু বলে 'ডাইনি !'

নবীনপুরে বাবা কাজ করেন, ওরা ওখানেই থাকে, ছুটিতে কলকাতায় দাদুর কাছে যায় সবাই। দাদুর তো ছোটখাটো 'ফ্ল্যাট' বাড়ি, তাতে আবার বাঘা কুকুর টাইগার আছে, তাই টাইনিকে এখানেই পুরানো লোক রামুদার জিম্মায় রেখে গেল। নৌকোয় নদী পার হয়ে ওপারে রেল স্টেশন, টাইনি খেয়াঘাট অবধি ওদের সঙ্গে গেল ; নৌকো ছাড়লে পরে তার কুঁই কুঁই কান্না শুনে বাবলিরও কান্না পেল।

ঠাকুর্দা ঠাকুরমায়ের আদরে, নানারকম তামাসা দেখে, ছুটিটা কি আনন্দেই যে কাটল ! বিজুর তো আর ফিরতেই ইচ্ছা করছে না, বাব্‌লির কিন্তু খুব ভাল লাগলেও, টাইনির জন্যে বড্ড মন কেমন করছে।

ছুটির শেষে বিদায় নিয়ে সবাই ফিরে আসছে—নবীনপুরের ঘাটে রামুদা দাঁড়িয়ে আছে,তার পিছনে পাগলের মত লাফাচ্ছে আর লেজ নাড়ছে টাইনি—নৌকো থেকে নেমেই বাব্‌লি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। রামুদা বলল,'টাইনি রোজ সকালে খেয়েই, ছুটে ঘাটে গিয়ে সারাদিন বসে থাকতো— বেলাশেষে শেষ খেয়াটি দেখে, তবে বাড়ি ফিরতো।'

বাড়িতে পৌঁছে মা দেখলেন বাব্‌লির গলার হারটা নেই ! কি হল ? কোথায় গেল ? খোঁজ ! খোঁজ ! খুঁজবে কোথায় ? ট্যাক্সিতে, নৌকোয় না রেলগাড়িতে কোনখানে পড়েছে, কে জানে ! বাবা বললেন, 'পথেঘাটে গয়না পরতে তাইতো মানা করি !' মা বললেন, 'বাব্‌লি যে কিছুতেই খুলতে চাইল না !' বাব্‌লি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, 'ঠাকুমা যে বললেন সব সময়ে পরে থাকতে !' বিজু বলল, 'বাব্‌লি নয়তো, তুই একটা হাব্‌লি।'

সবাই দুঃখ করছে, এমন সময়ে টাইনি ঘরে এল—মুখে করে কি একটা এনে সে বাব্‌লির কোলে রাখল, আর এমন করে চারদিকে তাকাল, যেন খুব একটা বাহাদুরি করেছে—আরে, এই তো বাব্‌লির সেই হারটা। তখন টাইনির আদর দেখে কে ? এমন কি, মোতির মাও বলল, 'টাইনিমনি, সোনামনি।'



আকাশ পিদীম



ভীষণ মন খারাপ হয়েছে মণ্টুর। বিকালে বেড়াতে যাবে বলে সাজগোজ করছিল, খুকু তার পাশে বসে 'ললিপপ' চুষছিল। হঠাৎ খুকুটা 'বাঃ বাঃ!' বলে তার নতুন জামাতে লালাঝোলা-নোংরা হাত বুলিয়ে দিল। অমন সুন্দর জামাটায় ছাপ ছাপ দাগ লেগে গেল, মণ্টু রেগে একটু ঠেলা দিতেই আহ্লাদী মেয়ে উলটে পড়ে গিয়ে চিৎকার কান্না জুড়ে দিল—অমনি কোথা থেকে দাদা ছুটে এসে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে মণ্টুর মাথায় এক চাঁটি! মাও এসে পড়লেন, 'ছি মণ্টু, ছোট বোনটিকে এমন করে লাগিয়ে দিলে? ইসস—কপালটা একেবারে ফুলে উঠেছে'—বলে খুকুর মাথায় জলপটি বেঁধে বাতাস করতে বসলেন। এতে কার না দুঃখ হয় বল তো? যত দোষ সব মণ্টুর, আর খুকু যে তার নতুন জামা নষ্ট করে দিল, তার বেলা?

মণ্টু বেড়াতে গেল না, রাতে ভাল করে খেল না, এখন ঘুম আসছে, কিন্তু, খুকু মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে বলে ঘুমোতে পারছে না—বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।

সামনের তিনতলা বড় বাড়িটার মাথায় 'আকাশ পিদীম' জ্বলছে সবচেয়ে উঁচুতে আর সবচেয়ে বড়। তেলের পিদীম নয়, ঠিক যেন ছোট্ট একটি চাঁদের মত বিজলী বাতি।

মণ্টুর মনে হল, এই ঘুপসি ঘর আর কান্নাকাটি বকুনি থেকে পালিয়ে ঐ উঁচুতে উঠে যেতে পারলে বেশ মজা হয়।

'বেশ তো, উঠে এলেই তো হয়!' আকাশ পিদীম বলল!

আরে, পিদিমটা যে কেমন মজার দেখতে হয়ে গেছে—কালো বোতামের মত গোল চকচকে দুটো চোখ, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত মস্ত বাঁকা নাক, গাধার কানের মত লম্বা ছুঁচলো দুটো কান, এ-কান থেকে ও-কান অবধি ঠোঁট দুটো ফাঁক করে দুপাটি দাঁত বের করে হাসছে!

অবাক হয়ে মণ্টু বলল—'কেমন করে যাবো?' 'এই যে সিঁড়ি নামিয়ে দিচ্ছি' বলে আকাশ পিদীম কাঠির মত সরু হাত দিয়ে ঘড় ঘড় করে একটা হাতল ঘোরাল, অমনি সড় সড় করে একটা তার নেমে এল—মণ্টু দুহাতে তারটাকে ধরতেই আবার সেটা উপরে উঠে গেল।

উঃ! কত উঁচুতে উঠে গেছে মণ্টু! চারদিকে কত বড় বড় বাড়ি, কি সুন্দর সাজানো সব ঘর, কত আলো, গান বাজনা! তারে ঝুলে ঝুলে সারা রাত সে দেখল তাদের বাড়িটা ঐ কত নিচে পড়ে আছে, ভাল করে দেখাই যায় না।

সবাই এখন বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়েছে নাকি? খুকু কি এখনও কাঁদছে? সত্যি, বড্ড লেগেছে বেচারার! মনটা কেমন করে উঠল, আকাশ পিদীমকে বলল, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে, এবার বাড়ি চল!'

'সেকি? তবে না বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে চাইছিলে?'

'না না, আমি বাড়িতেই যেতে চাই।'

'তবে যাঃ—মর গিয়ে!' বলে এক ঠেলা মারল আকাশ পিদীম, অমনি বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে মণ্টু দুম করে পড়ে গেল—এক্কেবারে খাট থেকে মেঝেতে!

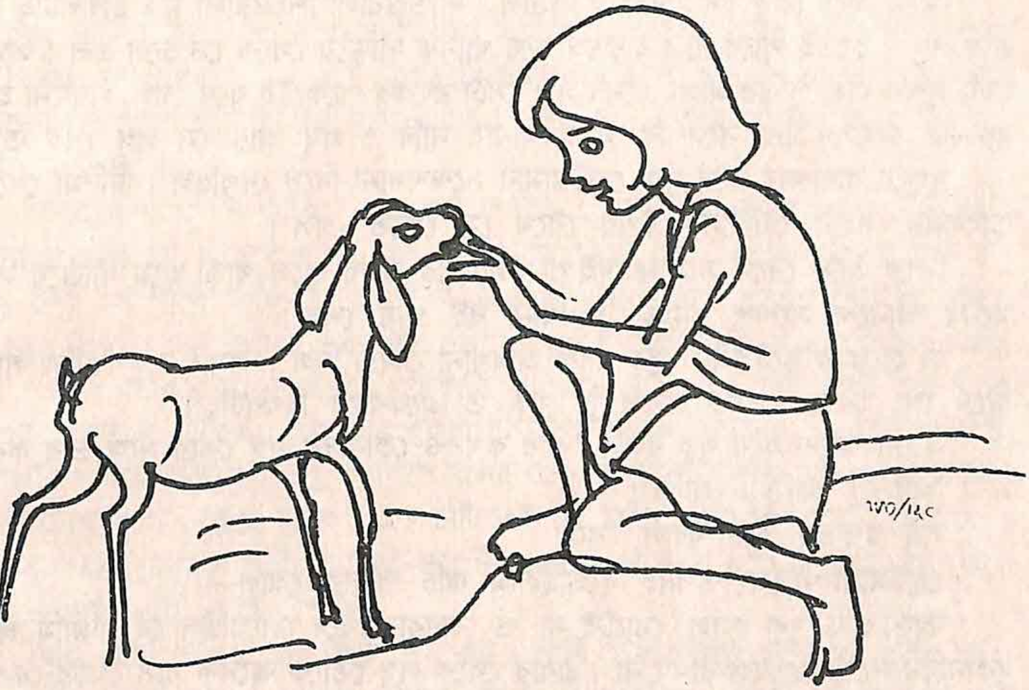
বাবা তাকে ধরে তুললেন, মা জলপট্টি দিয়ে বাতাস করলেন, দাদা হাত বুলিয়ে দিল, খানিক পরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। খুকুর মত, তার কপালটাও ঢিপি হয়ে ফুলে উঠেছে।

সকালে উঠেই ঘুমন্ত খুকুর কপালে আস্তে চুমু দিল মণ্টু।

মা দুধ রুটি নিয়ে এসে বললেন, 'তোর জামাটা কাল রাতেই সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি। ব্যথাটা এখন কেমন আছে?'

মণ্টু একগাল হেসে বলল, 'ব্যথা সেরে গেছে মা!'

লম্বু



মায়ের সঙ্গে খুকু মামাবাড়িতে এসেছে। মামাদের একটা সাদা ধবধবে ছাগলছানা, ছোটমামা ধরে এনে দিল।

খুকু তাকে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'ওমা, কি সুন্দর ! কেমন কচি কচি দাঁত, কেমন নরম গা, আবার কেমন পায়ে ছোট জুতো পিনেছে।'

মামা বলল, 'দূর বোকা ! জুতো নয়, ওটা খুর। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, হরিণ এদের পায় নখ আর আঙুলের বদলে এমনি খুর থাকে।'

লম্বা লম্বা কান, তাই দাদু ছাগলটার নাম দিলেন লম্বকর্ণ, সবাই ডাকে 'লম্বু'।

লম্বুর সঙ্গে খুকুর খুব ভাব হল, তাকে নিয়ে কত খেলা করে, কচি ঘাস আর ছোলা খাওয়ায়। ছোটমামা বলে, 'বাঃ, খেয়েদেয়ে বেশ মোটা হয়েছে ত, এইবেলা একদিন কচি পাঁঠার ঝোল—'

খুকু হাঁউমাউ করে ওঠে, 'না না, লম্বুকে কেউ খাবে না !'

বাড়ি ফিরে যাবার সময়ে লম্বুর জন্য খুকুর খুব কষ্ট হল।

দিদিমা বললেন—'শিগগিরই আবার এসো—লম্বুকে নিয়ে খেলা করো !'

শিগগির আর মামাবাড়ি আসবার সুযোগ কিন্তু হয়ে উঠল না, আসা হল প্রায় দুবছর পরে। এসেই ত খুকু 'লম্বু কোথায় ?' বলে ছুটল বাগানে, যে গাছতলায় তারা খেলা করত সেইখানে।

কাছে গিয়ে কিন্তু সে থমকিয়ে দাঁড়াল। দাড়িওয়ালা শিংওয়ালা মস্ত ছাগলটাই কি তার লম্বু ? হতেই পারে না। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে সে চলে এল ! লম্বুর জন্য সুন্দর নীল পুঁতির মালা এনেছিল। সেটা ফ্রকের পকেটেই রয়ে গেল, পরানো হল না—ঐ ছাগলদাড়ির সঙ্গে কি মালা মানায় নাকি ? লম্বু আর সে লম্বু নেই ত !

দুপুরে বারান্দায় বসে খুকু ছোটমামার সন্দেশখানা নিয়ে দেখছিল। দিদিমা খেতে ডাকলেন, বইটা টেবিলের উপর রেখে সে খেতে গেল।

ফিরে এসে দেখে সামনের দুই পা টেবিলের উপর তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বু মনের আনন্দে সন্দেশ খাচ্ছে, আধখানা বই প্রায় শেষ !

হাঁ হাঁ করে ছুটে গিয়ে খুকু বাকি আধখানা কেড়ে নিল। অমনি লম্বু তিড়িং লাফ দিয়ে শিং নেড়ে তেড়ে মারল ঢুঁ, খুকু ত একেবারে চিৎপটাং !

কাঁদো কাঁদো হয়ে খুকু বলল, 'আর কখনও কোনদিন লম্বু তোর সঙ্গে ভাব করব না ! আড়ি। আড়ি। আড়ি।'

লম্বু হতভম্ব হয়ে বলল, 'ব্যা!

ছোটমামা বলল, 'তখনই বলেছিলাম কচি পাঁঠার ঝোল—'

তাড়াতাড়ি খুকু বলল, 'মোটেই না, ও বেচারার খিদে লেগেছিল যে। আমি আর কোনদিন সন্দেশ ফেলে রাখব না। এবার থেকে লম্বু তোকে অনেক ঘাস খেতে দেব। আর আমাকে মারবি না ত ?'

খুশি হয়ে লম্বু বলল, 'ব্যা ব্যা।'



ভুলোর ভুল

নরম ঘাসের উপর রোদে শুয়ে আরামে ঘুমিয়েছিল ভুলো, হঠাৎ চমকে উঠে চোখ মেলে যা দেখল তাতে তার চোখদুটো ছানা-বড়া হয়ে গেল। কানদুটো শেয়ালের কানের মত খাড়া হয়ে উঠলো, সারা শরীর শিউরে উঠে গায়ের লোমগুলো কাঁটার মত দাঁড়িয়ে উঠল!

ওরে বাবা! ওটা কীরে? এত বড় পোকা ত সে জন্মে কখনো দেখেনি। ছোট ছানা হলে কি হয়, ভুলোর সাহস আর গায়ের জোর তো কারো চেয়ে কম নয়, কত বড় বড় ইঁদুর সে মারে, কাক-চিল-চড়াই কাউকে বাগানের কাছে বসতে দেয় না, কুকুর বেড়াল কিম্বা অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু এই যে তার মাথার সমান বড়, গুবরে পোকার মতন দেখতে পোকাটা থ্যাবড়াভাবে কুরকুর করে হেঁটে তার দিকে এগিয়ে আসছে এটাকে দেখে তার বুকটা ঢিপঢিপ করছে, পিছনের পা দুটো কাঁপছে, লেজটা গুটিয়ে আসছে! তবু প্রাণপণে মনের জোর করে চোখ বুজে মারল এক চাঁটি।

চোখ খুলে দেখল, আরে! এক চাঁটিতেই পোকাটির মাথা-পা সব উড়ে গেছে? সাহস পেয়ে সাবধানে পা দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল,—নড়ে না চড়ে না, সাড়া শব্দ করে না, একদম মরে গেছে পোকাটা।

যাক, বাঁচা গেল। আর কোন ভয় নাই। ভারি আরাম বোধ হল, মনে ভারি গর্বও হল—কি সাহস তার! কেমন গায়ের জোর—অতো বড় বিরাট পোকাটাকে এক চাঁটিতেই সাবাড় করে দিল! ভাবতে ভাবতে মনের আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একেবারে লাফিয়ে উঠল— উ-হু-হু। কে যেন তার লেজটা কেটে নিল। চিৎকার শুনে হাবুল, মিনি, বুঁচু ছুটে এসে দেখল, ভুলো বেচারা পাগলের মত বাগানময় ছুটছে আর তার লেজ কামড়িয়ে ঝুলছে সেই সুন্দর ছোট্ট নতুন কচ্ছপটা।

কাল বাবা এটাকে কিনে এনেছিলেন ওরা পুষবে বলে, রাতে সেটাকে চৌবাচ্চায় রেখে দিয়েছিল, কখন যে উঠে বাগানে পালিয়েছে! কচ্ছপের কামড় বড় বিষম কামড়। ছাড়াতে গিয়ে ভুলোর লেজের লোম অনেকটা উঠে গেল। ভাগ্যিস বেশ ঝাঁকড়া লোম ছিল। তাই খুব বেশি লাগেনি, মলম দিতেই ব্যথা সেরে গেল।

ছেলেমেয়েরা রোজ কচ্ছপকে খাওয়ায়। আদর করে। ভুলো তার ধারেকাছেও যায় না—দূর থেকে দেখে আর ভাবে, 'এমন বিদঘুটে জানোয়ারও মানুষ শখ করে পোষে!'

ইঁদুর ছানা



ভাঁড়ার ঘরের কোণে গর্তের ভিতরে নেংটি ইঁদুরের বাসা, সেখানে থাকে মা-ইঁদুর আর তার ছোট্ট তিন ছানা—কিচমিচ, কুটকুট আর তিড়িং তিং। রোজ রাতে মা-ইঁদুর খাবার খুঁজতে বেরোয়, ছানাদের বলে যায়—'সাবধানে থাকবে, বাসা থেকে বেরোবে না—বাইরে বিল্লী-দত্যি বসে আছে, কপ করে খেয়ে ফেলবে।'

একদিন মায়ের ফিরতে একটু দেরী হল। ছানাদের খিদে পেয়েছে, তারা খাবারের খোঁজে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখল, ঢাকনি-আঁটা সারি সারি টিন, বোতল, বৈয়াম, হাঁড়ি, তার মধ্যে কত কি খাবার আছে কে জানে!

সামনেই মাটিতে একটা কিসমিস কুড়িয়ে পেয়ে তিড়িং তিং তিড়িং তিড়িং করে নাচতে লাগল; কুটকুট এক টুকরো শুকনো রুটি পেয়ে কুটুর-কুটুর করে খেতে লাগল।

কিচমিচ কিচির মিচির করে বলল—'আমি যে কিচ্ছুই পাচ্ছি না ভাই!' কুটকুট তার রুটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল—'আয় দুজনে মিলে খাই।'

হঠাৎ 'ম্যাও' করে একটা বিকট আওয়াজ হল। ওরে বাবা! জানলার ফাঁকে ইয়া গোঁফওয়ালা, দাঁত খিচানো মস্ত একটা হাঁড়িমুখ! সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে!

তড়াক করে ছানারা একটা টিনের উপর উঠল। টিনের মাথায় একটা গোল ফুটো। যেই না বেড়ালটা ধুপ করে মাটিতে নামল, অমনি ছানারা সেই ফুটো দিয়ে ঝুপ ঝুপ করে টিনের ভিতর নামল।

বেড়ালটা ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু কোথাও ইঁদুর দেখতে পাচ্ছে না—এদিক-ওদিক ঘুরে, এখানে-সেখানে শুঁকে, খানিক পরে সে আবার বেরিয়ে গেল।

ছানারা কিন্তু টিনের ভিতর থেকে বেরোতে পারছে না! সেটা ছিল তেলের টিন—তেল ছিল না, কিন্তু ভিতরটা এমনি তেলতেলে, পিছল হয়েছিল যে বেয়ে কিম্বা লাফিয়ে উঠতে পারল না কিছুতেই। তখন তিনজনে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

ওদিকে মা-ইঁদুর অনেক খাবার নিয়ে এসে দেখে ঘরময় বেড়ালের পায়ের ছাপ, বাসায় কেউ নেই! চিৎকার করে ডাকল—'কিচ মি—চ! কুট কু—ট, তিড়ি-তি—ং!'

ছানারা ডুকরে কেঁদে উঠল—'মাগো, আমরা এই যে, এখানে। টিনের মুখটা সামনের দুই পায়ে আঁকড়িয়ে ধরে ভিতরে ঝুলে পড়ে, মা তার লম্বা লেজটা নামিয়ে দিল, ছানারা একে একে লেজ বেয়ে উঠল,—তাদের তেলে-ভেজা ভয়ে আধমরা চেহারা দেখে মায়েরও কান্না পেল।

বাসায় নিয়ে ছানাদের মুছে, চেটে পরিষ্কার করতে করতে মা বলল—'এত করে বললাম, তবু কথা শুনলে না। আর একটু হলেই কী সর্বনাশ হত, বল ত?'

ছানারা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আর কখনও এমন করব না।' পরিষ্কার হয়ে, পেট ভরে খেয়ে, তারা মায়ের কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ল।



দুই ভাই



দুই ভাই কানু আর ভানু, দুই ডেলা নরম কাদামাটি নিয়ে বসেছে। কানু মাটি দিয়ে একটা রাজহাঁস গড়ছে আর ভানু গড়ছে মাটির পুতুল।

হাঁস তৈরি হয়ে গেল, সাবধানে সেটাকে তাকের উপর রেখে কানু বলল—'এটাতে হাত দিস না ভানু, এখন কাঁচা আছে, ধরলে নষ্ট হয়ে যাবে, বুঝলি ? আমি হাত ধুয়ে আসছি, তুইও তাড়াতাড়ি নে, এখনই ভজুদা এসে তাড়া লাগাবে।'

ভানুর পুতুল তৈরি হয়ে গেল, সেটাকে কানুর হাঁসের পাশে রেখে দিল। কি সুন্দর হয়েছে হাঁসটা। ভানুর ভারি লোভ হল সেটা হাতে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে। আস্তে আস্তে নামাচ্ছে, এমন সময় কানুর পায়ের শব্দ পেয়ে, তাড়াতাড়ি রেখে দিতে গেল। হঠাৎ কেমন করে যেন হাত ফসকিয়ে, থ্যাপ করে মাটিতে পড়ে হাঁসের নরম গাটা থ্যাবড়া হয়ে গেল আর লম্বা গলাটা হেলেদুলে মট করে ভেঙ্গে পড়ল। ঘরে ঢুকেই কানু চিৎকার করে উঠল—'কি করলি ! তোকে না ছুঁতে মানা করেছিলাম ?' রাগে ক্ষেপে গিয়ে সে ভানুর পুতুলটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে দিল।

তারপর দুজনে তুমুল লড়াই বেধে গেল । ভজুদা হাঁহাঁ করে ছুটে এসে থামিয়ে দিল। ভজুদা ওদের অনেক দিনের পুরোনো লোক, আজ বাবা-মা সারাদিনের জন্য

বাইরে গিয়েছেন, ভজুদাই ওদের দেখাশোনা করছে।

ছুটির দিনে দুভাই চৌবাচ্চার জল ঝাঁপাঝাঁপি করে স্নান করে, আজ আর তা হল না। খাওয়াও ভাল করে হল না, অনেক সাধাসাধি করে ভজুদা ওদের দুটি ভাত খাওয়াল। সারাদিন কেউ কারো কাছে এল না, কথা বলল না, রাগ করে দুজনে দুইঘরে বসে রইল। রাতে বাবা-মা ফিরে এসে যখন ডাকলেন তখন খেতে গেল। হাসিগল্প নেই, কথাবার্তা নেই। দুজনে মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে।

মা বললেন—'কি হল তোমাদের ? শরীর খারাপ লাগছে না ত ?'

ভানু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল—'দাদা আমার পুতুল ভেঙ্গে দিয়েছে।'

কানু বলল, 'ও যে আগে আমার হাঁস ভেঙ্গেছে।' 'আমি ত আর ইচ্ছে করে ভাঙ্গিনি, হঠাৎ পড়ে গেল। দাদা ইচ্ছে করে মাড়িয়ে আমার পুতুল ভেঙ্গেছে।'

সব কথা শুনে বাবা বললেন—'দোষ ত দুজনেরই হয়েছিল, তারপর দুজনেই দুজনকে মেরেছ ! ব্যস, শোধবোধ হয়ে গেল, এবার মিটমাট করে নাও, কেমন ?'

ওরাও মিটমাট করতেই চায়। দুই ভাইয়ে খুব ভাব, ঝগড়া মারামারি হয় না, আজ হঠাৎ, রেগে, মারামারি করে, এখন ভারি খারাপ লাগছে। কিন্তু কে আগে ভাব করবে ?

কানু ভাবছে, ভানু আগে দোষ করেছে, তারই ভাব করা উচিত। আর ভানু ভাবছে, দাদা বেশি দোষ করেছে। সেই আগে ভাব করবে।

মন খারাপ নিয়ে ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে উসখুস করতে করতে শেষে কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা একটা খুব চেনা মোটরের ভেঁপুর আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল—ভপ-পঁপ-পঁপ। ভঁপ-পঁ-পঁপ-ভঁপ-পঁপ-পঁ-পঁ।

অমনি দুই ভাই লাফিয়ে উঠে 'ছোটমামা, ছোটমামা !' বলে বাইরে ছুটল।

ছোটমামা বললেন—'কই ? তোরা এখনও রেডি হসনি ? পিকনিকে যাবি না ?'

তাই ত ! আজ যে নববর্ষ, আজ ছোটমামার বাগানে পিকনিক করবার কথা, কালকের গোলমালে ওরা সে কথা ভুলেই গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে, ফিটফাট, রেডি হয়ে এসে দেখল যে বাবা-মাও তৈরি, খাবারও তৈরি। টিফিন বাক্স, বাসন-পত্র গোছানো হয়ে গেছে। চা খেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে মামাদের চমৎকার বাগানে, মামাতো ভাইবোন রানা আর সীতার সঙ্গে বেড়িয়ে, নদীতে স্নান করে, গাছতলায় বসে ভোজ হল। মা আর মামীমা রান্না করলেন। গাছে চড়ে, কাঁচা আম পেড়ে, ভাইবোনে কত মজার খেলা করে হাসি-গল্প-গানে ভারি আনন্দে কাটল দিনটা।

বিকালে নৌকা চড়ে নদীতে একটু বেড়িয়ে বাড়ি ফেরবার সময় হল। সেই সব গল্প করতে করতে রাতে বিছানায় শুয়ে একটু পরে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। কালকের ঝগড়া-মারামারি ? সেকথা এখন তাদের মনেও নেই—একদম ভুলে গেছে !



খবরদার

দুপুরবেলা—বাইরে রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, ঘরের ভিতর মিনা মায়ের কাছে শুয়ে গল্প শুনছে। খানিক পরে মা ঘুমিয়ে পড়লেন, অমনি মিনা উঠে পা-টিপে-টিপে বাইরে গেল।

সামনের ছাতে মা কতরকম যে আচার রোদে দিয়েছেন, দেখলেই খেতে লোভ হয়, শুঁকলেই জিভে জল আসে! মিনা সবে অসুখ থেকে উঠেছে, তাই তার আচার খাওয়া মানা, রোদে যাওয়াও মানা।

চুপি চুপি ঢাকনি খুলে, বেশ মোটা একছড়া তেঁতুলের আচার তুলে মুখে দিতে যাবে, হঠাৎ কে যেন বলে উঠল 'খবরদার!' এমনি চমকে গেল মিনা যে আচারটা হাত থেকে পড়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নাই! 'নিশ্চয় ভুল শুনেছি'—ভেবে একটু পরে সে আবার আস্তে আস্তে হাত বাড়াল—আবার কে বলল, 'ভাল হবে না বলছি!'

এবার ভীষণ ভয় পেয়ে মিনা ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ মেলে মা বললেন—'গরমে ঘুরে বেড়িও না মিনু, একটু ঘুমোও!' মিনার বুকটা তখনও টিপ টিপ করছিল! মাকে সব কথা বলতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে যে লুকিয়ে আচার খেতে রোদে গিয়েছিল, তাই লজ্জায় কিছু বলতে পারল না।

ওর দাদা-দিদি মণ্টু আর রিনা স্কুল থেকে ফিরলেই মিনা তাদের সব কথা বলল। রিনা ভয়ে ভয়ে বলল—'ভৌতিক ব্যাপার নয় ত ?' মণ্টু হেসেই সব উড়িয়ে দিল।

রোজ বিকালে ছাতে কত খেলা হয়, আজ মিনার কোন খেলাতেই মন বসছে না। খানিক পরে রিনাও বলল—'চল ঘরে যাই—মিনার হিম লাগবে।'

মণ্টু বলল—'কোথায় হিম ? ও, ভূতের ভয়ে ঘরে পালাচ্ছিস বুঝি ? আমি বাপু ভূতকে কেয়ার করি না। আসুক না বাবা-ভূত, ছানা-ভূত, পাকা-ভূত, কাঁচা-ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত !'—'খবরদার ! ভাল হবে না বলছি !'—ঠিক তার মাথার উপর থেকে কে ধমক দিল ! রিনা-মিনা ত ভয়ে কাঠ ! মণ্টুও হাঁ করে উপর-দিকে চেয়ে রইল।

অনেকটা উঁচুতে দেয়ালের গায়ে একসারি ঘুলঘুলি। মই লাগিয়ে উঠে মণ্টু ঠিক তার মাথার উপরকার ঘুলঘুলির ভিতর হাত ঢোকাল, 'ঝটপট-চ্যাঁ-চ্যাঁ' শব্দ হল, তারপর একটা কালো পাখিকে চেপে ধরে নিয়ে সে নেমে এল। পাখিটা সমানে চেঁচাচ্ছে—'খবরদার ! ভাল হবে না বলছি ! খবরদার !—'

মা বললেন—'এটা নিশ্চয় কারো পোষা ময়না, খাঁচা থেকে পালিয়ে এসে হয়ত কাক-চিলের ভয়ে ওখানে লুকিয়েছিল, কেমন কথা বলছে দেখ না ! ঠিক যেন মানুষের মত।' রিনা-মিনা-মণ্টু হেসে বলল—'তাই ত। আমাদের সবাইকে এমন বোকা বানিয়ে দিয়েছিল !'

লালু আর নীলু

বড় বাড়ির 'খোকনবাবু' টাট্টুঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। তাই দেখে, নীলু বলল, 'ওমা আমায় একটা ঘোড়া কিনে দাওনা।' মা একটা কাঠের ঘোড়া এনে বলল, 'আমরা গরীব মানুষ, বাবুদের মত ঘোড়া কোথায় পাব বাবা ? এই ঘোড়া নিয়ে খেলা কর।'

ছোট লাল ঘোড়া, নীলু তার নাম রাখল 'লালু'। সারাদিন সে লালুকে নিয়ে খেলা করল, খাবার সময়ে লালুর মুখেও খাবার গুঁজে দিল, রাতে তাকে নিজের বিছানায় ঘুম পাড়াল। লালু এখন ছোট ছানা, খেয়ে দেয়ে বড় হবে, তখন তার পিঠে চড়ে কত বেড়াবে—ভাবতে ভাবতে নীলু ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ শুনল, 'চি-হি-হি ! বেড়াতে যাবে না ?' চেয়ে দেখে, আরে ! লালু কত বড় হয়ে গেছে ! তড়াক্ করে নীলু তার পিঠে চড়ে বসল, অমনি লালু ছুটল—খট্ খটাস্-খট্ খট—।

খোকনও তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, ওদের দেখে হেসে বলল, 'রেস দেবে ?' টগ-বগ্ টগ-বগ্ খট্-খট্—খট্-খট্—দুই ঘোড়া ছুটল—দেখতে দেখতে টাট্টুকে পিছনে ফেলে লালু অনেকদূরে এগিয়ে গেল !

শহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে, নদীর ধারে খানিক ঘুরে বেড়িয়ে, নীলু বলল,'এবার ঘরে চল, লালু।' নীলুকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়েই লালু আবার পা বাড়াল—'চি-হি-হি ! চললাম !'

'ওরে লালু, কোথা যাস্ ?' বলে নীলু তার লেজ টেনে ধরল।

'উঃ হুঃ হুঃ—চুলগুলো যে ছিঁড়ে দিলি রে ! ও নীলু, স্বপন দেখছিস নাকি ?' মায়ের ডাকে জেগে উঠে নীলু দেখল, ছোট লালু তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে—লালুর লেজ ভেবে সে মায়ের চুল টেনে ধরেছে !





ভালু

কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া লোম-ওয়ালা কুকুরটা দেখতে ঠিক যেন ভাল্লুকছানার মত, তাই বাদল তার কুকুরের নাম রেখেছে 'ভালু'।

ভালুকে সে অনেক কায়দা শিখিয়েছে—'হ্যাণ্ডসেক' করতে বললেই ভালু তার 'ডান হাত' (মানে ডান-পা) বাড়িয়ে দেয়, কপালে 'হাত' ঠেকিয়ে সেলাম করে ; শূন্যে খাবার ছুঁড়ে দিলে এক্‌লাফে সেটা লুফে নেয়, দূরে বল ছুঁড়ে দিলে ছুটে গিয়ে মুখে করে নিয়ে আসে, আরও কত কি খেলা করে। তাছাড়া ভালু খুব ভাল পাহারা দেয়।

ভারি গরম পড়েছে, বাদল তার বাবার কাছে বারান্দায় শুয়েছে। পাশেই বাগান, বেশ হাওয়া আসে। দুপুর রাতে ভালুর চিৎকারে বাদলের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে যা দেখল, তাতে ভয়ে তার হাত-পা হিম হয়ে এল—বিছানায় মস্ত বড় একটা সাপ ! ভালু সেই সাপের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে গোঁ গোঁ করছে, সাপটাও ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে।

বাবা তার মোটা লাঠিটা কাছে নিয়ে শোন, তিনি যেই সাপ মারবার জন্যে লাঠি তুলেছেন, ঠিক সেই সময়ে ভালু হঠাৎ এক লাফে সাপের মাথা কামড়িয়ে গুঁড়ো করে দিল—তখনই সাপের দফা শেষ !

বাড়ির সকলে জেগে উঠে ছুটে এল—

বাবা বললেন—'ভালু আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে না থাকলে সাপটা নিশ্চয় আমাদের কামড়াত। এ সাপের ভয়ানক বিষ !'

সবাই ভালুকে কত আদর করল। সকালে পাড়ার লোকে ভিড় করে এসে ভালুকে বাহবা দিল, মরা সাপটাকে সামনে রেখে ভালুর ফটো তোলা হল, চারিদিকে 'বীর ভালুর' নাম রটে গেল।

কিন্তু ভালুর কি যে হল ! সাপের মাথা চিবিয়ে বিষ লেগে গেল নাকি ? সে আর ছুটোছুটি খেলা করে না, খায়না-দায়না, দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল। তার মুখে আর সারা গায়ে ঘা হল, গায়ের লোম ঝরে গেল—ভালু বুঝি আর বাঁচে না ! সকলের মন খারাপ হয়ে গেল।

কত ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে, তবে ভালু একটু একটু করে সেরে উঠল। তারপর তাকে হাওয়া বদলের জন্য দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে ভালু একেবারে ভাল হয়ে ফিরে এসেছে, আবার তেমনি ছুটোছুটি খেলা করছে। কালো রেশমের মত নরম, চকচকে নতুন লোমে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

হিংসুটি

রিনার জন্মদিন, কত হাসিখেলা গানগল্প খাওয়াদাওয়া, সবাই মিলে কত আনন্দ করছে, শুধু ওর ছোটবোন লীনার মুখে হাসি নাই। মুখ ভার করে লীনা সব দেখছে আর ভাবছে—এই তো সেদিন আমার জন্মদিন হয়ে গেল, কই,তখন তো এমন মজা হয়নি ? আমার বেলায় শুধু মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনরা সব এসেছিল, দিদির বেলায় আবার একপাল বন্ধু এসেছে ! আমার কেক্‌টায় মোটে পাঁচটা বাতি ছিল, দিদির কেক্‌ ঘিরে দশটা বাতি ঝলমল করছে ! কত গাদাগাদা উপহার পেয়েছে দিদি !

উপহারগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চম্‌কে উঠল লীনা—আরে সেই যে সেদিন দোকানে কি চমৎকার পুতুলটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু অনেক বেশি



দাম বলে মা কিনলেন না, ঠিক তেমনি একটা পুতুল পেয়েছে দিদি ! ইস্‌স্—কি যে করতে ইচ্ছা হয় দিদিকে—দিদিটা ভারি বিচ্ছিরি, ভীষণ দুষ্টু । মা তবু দিদিকেই বেশি ভালবাসেন—সব ভালো-ভালো জিনিস বেশি বেশি করে দিদিকেই দেন ! আর সইতে পারল না লীনা, মাথা ধরেছে বলে ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ।

ধুমধাম শেষ হল, সবাই বাড়ি গেল, অনেক সাধাসাধি করা হলেও লীনা কিছুই খেল না—দিদির উপর হিংসায় আর মায়ের উপর অভিমানে তার মনটা ভরে রয়েছে । এবার দাদু এসে চুপি চুপি বললেন, 'কি হয়েছে, ঠিক করে বল্‌তো দিদিমনি—শরীর খারাপ, না মন খারাপ ?'

দাদুর সাথে লীনার খুব ভাব, যত মনের কথা তাঁর কাছেই বলে ; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে তার সব দুঃখ, নালিশ দাদুকে জানাল ।

দাদু হেসে বললেন—'তুই কোথাকার বোকা রে ? তোর পাঁচ বছরের জন্মদিন তাই পাঁচটা বাতি, আর রিনার দশবছরের জন্মদিন তাই দশটা বাতি—এ তো সোজা কথা ! তোর কারো সাথে ভাব নেই, কেবল ঝগড়া, তুই কাউকে নেমন্তন্ন করলি না ; ভাই-বোনদের মধ্যেও কে খেলায় জিতল কে লটারিতে ভাল প্রাইজ পেল তাই নিয়ে কান্নাকাটি করলি । রিনার অনেকের সাথে ভাব, তাদের নেমন্তন্ন করেছে, তাদেরই কেউ দামী পুতুলটা দিয়েছে—মা তো দেয়নি । আসল কথা, তুই বেজায় হিংসুটি ! হিংসে

জিনিসটা কেমন, জানিস ? এই আমার কালো চশমাটা চোখে দিয়ে দেখ—সব কালো ঝাপসা দেখছিস তো ? আবার খুললেই সব পরিষ্কার ; হিংসার চোখ দিয়ে দেখলেও তেমনি ভাল জিনিস কালো লাগে, সোজা জিনিস ঘোরালো প্যাঁচানো মনে হয় । নে, আর পাগলামি করিসনে, উঠে খেতে চল ।'

খিদে খুবই পেয়েছিল, দাদুর কথায় লীনা ভালমানুষটির মত উঠে খেতে গেল । ও ঘরে যেতেই রিনা সেই পুতুলটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'এই দেখ, সেদিন পুতুলটা দেখে তুই নিতে চেয়েছিলি, ঠিক তেমনি একটা পুতুল পেয়েছি ! আমি তো অনেক জিনিস পেয়েছি, এটা আমি তোকে দিলাম ।'

লীনা তো অবাক ! কি যে আনন্দ হল, আবার কেমন কান্নাও পেল হঠাৎ । কিছু বলতে পারল না, মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে দিদিকে জড়িয়ে ধরে, অনেক অনেক চুমু খেল । তারপর, পুতুল কোলে নিয়ে বসে কপাকপ খেতে লাগল—ওঃ, মাংসের সিঙ্গাড়াটা ভী—ষণ ভালো হয়েছে । চিঁড়ে ভাজা, ঘুগ্‌নী, পাটিসাপটা, সন্দেশ, রসগোল্লার পায়েস, সবই চমৎকার ; আর কেকটা যে কি দারুণ ভালো ! লীনার জন্মদিনের কেকের চেয়ে দিদির কেকটা ঢের—না-না-না—আর কোনোদিন লীনা দিদিকে হিংসা করবে না ।

'সে কোন বনের হরিণ'

ছোট্ট ছানাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা-হরিণ গিয়েছিল ঝরণার জল খেতে । বেচারার আর ঘরে ফেরা হল না—বনের বাঘ ঝরণার ধারে ওৎ পেতে বসেছিল, খ-প্ করে তাকে ধরে নিল । ভোরবেলা দুজন লোক বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, মা-মরা ছানাটাকে দেখতে পেয়ে তারা কোলে করে নিয়ে এল মনুদের বাড়িতে । মনুর বাবা সেটাকে কিনে নিলেন ।

কিছুদিন আগে ওদের পোষা ছাগল ধবলীর একটা ছানা হয়েছে, এই ছানাটাকে তার পাশে রাখা হল—ধবলী তাকেও নিজের ছানার মতই চেটে আদর করল । হরিণছানা আর ছাগলছানা দুই ভাইয়ের মত একই ছাগলমায়ের কাছে রইল ; মায়ের দুধ খেয়ে একটু বড় হয়েই, তারা কচি ঘাস পাতা খেতে আর ছুটোছুটি লাফালাফি করে খেলতে

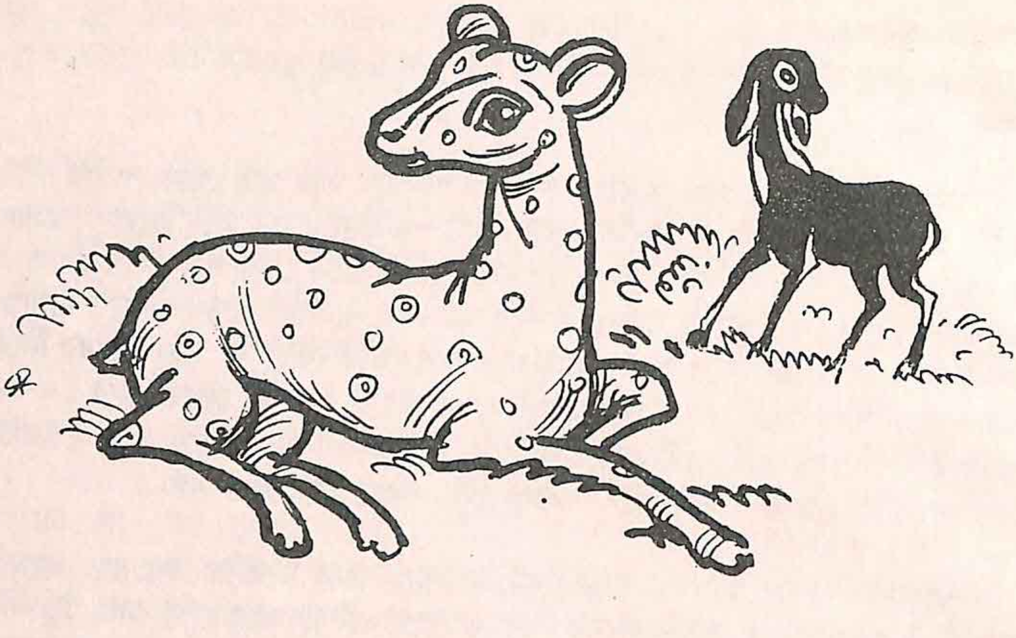
শিখল। হরিণছানার সারা গায়ে ঠিক যেন চন্দনের ফোঁটার মত সাদা সাদা ফুটকি, তাই তার নাম রাখা হ'ল 'চন্দন', ছাগলছানাটা সারাদিন নেচে কুঁদে বেড়ায় তাই তার নাম হ'ল 'কুন্দন'।

মনুর মা যখন পান সাজতে বসেন চন্দন প্রায়ই এসে তাঁর হাত থেকে পানের বোঁটা খায়। মজা দেখবার জন্য মা একদিন ছোট একটি পান সেজে তার মুখে দিলেন। মসলা দেওয়া মিঠাপান চন্দনের খুব ভাল লাগল—সে রোজ এসে ছোট পান খেয়ে যেতো। এখন চন্দন কুন্দন বড় হয়েছে, বাড়ির ভিতরে আসে না, বাগানেই থাকে—রাতে বাগানে একটা জাল-ঘেরা ছোট ঘরে ঘুমোয়। বিকালে স্কুল থেকে ফিরে মনু তার বন্ধুদের নিয়ে ওদের সঙ্গে খেলা করে। চন্দন দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে আর খুব ছুটতে পারে। কুন্দন মোটা হয়ে গিয়েছে তাই বেশী ছুটতে পারে না, শিং আর দাড়ি গজিয়ে তার চেহারাটা বেশ ভারিক্কি হয়েছে, মেজাজটাও একটু চটা—সহজেই রেগে যায়।

শহরের একধারে মনুদের বাড়ি। বাড়িটা ছোট, তবে বাগানটা মস্ত বড়, অনেক ফুলগাছ ফলগাছ পুকুর, সবুজ ঘাসের 'লন্'এর পরে এদিকে আর বাড়ি নেই, উঁচু-নীচু মাঠ আর ধানজমি পেরিয়ে ছোট একটা নদী—নদীর ওপারে দূরে পাহাড়। বাগানের বেড়ার ধারে গিয়ে চন্দন সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কি ভাবে কে জানে? ঐ বনেই যে ওর জন্ম হয়েছিল, সেকথা কি ওর মনে পড়ে? ওতো তখন খুবই ছোট ছিল। তবে কেন অমন করে তাকিয়ে থাকে? মালী বলল, 'ওকে আর বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না; আরেকটু বড় হলেই বনের হরিণ বনে পালিয়ে যাবে।' মনু চন্দনের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'না-না, চন্দন আমাদের খুব ভালবাসে, আমরাও ওকে এত ভালবাসি, আমাদের ছেড়ে ও কোথাও পালাবে না।'

ফাল্গুন মাস, শীত চলে গেছে, আমের গাছে 'বৌল' ভরে গেছে, নানারকম রঙিন ফুলে আর নতুন কচি পাতায় বাগানটা যেন ঝল্‌মল্ করছে, মনুর সাধ হল একদিন বন্ধুদের নিয়ে বাগানে পিক্‌নিক্ করবে। মা বললেন, 'বেশ তো, রবিবার তোমার বাবার আর আমার দুপুরে একটা নেমন্তন্ন আছে—সেদিন তোমরাও পিকনিক্ করো, কেমন?' রবিবার ভোরে উঠে মা পায়স আর টমেটোর চাট্‌নি রেঁধে, পান সেজে, চাল-ডাল ঘী তেল মসলাপাতি বাসনপত্র সব গুছিয়ে ঠিক করে দিলেন; ছেলেরা সকাল সকাল চা খেয়ে সেইসব মাথায় নিয়ে হৈ হৈ করে বাগানে চলল। সঙ্গে গেল মালীর ছেলে মহাবীর আর বুড়ীঝির নাতি পুঁটে।

বড় আমগাছটার তলায় ইঁট পেতে বাগানে ডালপালা কুড়িয়ে খিচুড়ি আর মুরগীর মাংস রান্না হল, বাগানের আলু বেগুন কফি ভাজা হল, উনুন নিভিয়ে সেসব বেশ করে ঢাকা দিয়ে ছেলেরা পুঁটে আর মহাবীরকে বলল, 'দেখিস, যেন কাগ-টাগ না আসে,



আমরা চট্ করে পুকুরে চান করে আসছি।' চট্ করে চান হল না। জল ছোঁড়াছুঁড়ি ঝাঁপাঝাঁপি খেলায় বেশ খানিক দেরীর পরে হঠাৎ খেয়াল হল,'চল্ চল্ খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে' বলে উঠতে যাচ্ছে এমন সময়ে পুঁটে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল, 'হই দাদাবাবুরা শিগগিরি এসো ! তোমাদের ছাগোলটা খ্যাঁচা খুলে বেইরে পড়েচে, ধোত্তে গেলে শিং নেইড়ে তেইড়ে আসচে !'

ছুট্-ছুট্-ছু-টে এসে ছেলেরা দেখল সব ভাজাভুজি আর কালাপতা দুজনে খেয়ে এখন চন্দন আরামে আমগাছে হেলান দিয়ে বসে পান চিবোচ্ছে। একথালা মিঠাপান প্রায় শেষ ! ওদিকে কুন্দন পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শিং বাগিয়ে রাগে ফোঁস-ফোঁস করছে;তার নাকে মুখে মাখামাখি হয়ে ছাগলদাড়ি বেয়ে টপ্ টপ্ করে পায়স ঝরছে। মাথার উপরে মহাবীর মুখটি কাঁচুমাচু করে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। গরম হাতা নিয়ে কুন্দনের নাকে ছেঁকা দিতে গিয়ে তার এই শাস্তি দেখে ওরা সবাই হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। পুঁটে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল,'সব পায়স শেষ করে দিয়েছে গো।' যাক হাঁড়িভরা খিচুড়ি আর মাংস তো আছে, চমৎকার চাটনিটাও কি ভাগ্যি চন্দন কুন্দন দেখতে পায়নি, তাই দিয়ে বেশ পেট ভরেই খাওয়া হ'ল। তাছাড়া গাছে পাকাকুল, পেয়ারা এসব তো আছেই। গাছে চড়ে ফল খেয়ে গান গেয়ে ছুটোছুটি হুটোপুটি খেলা করে কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল, বিকাল হতে না হতেই আবার খিদে পেয়ে গেল।

ডালপালা জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে ওরা গান করছে 'যাবো না যাবো না যাবো না ঘরে—' এমন সময় বাবা মা ফিরে এলেন। আরো খানিকটা পায়স মা ঘরে তুলে

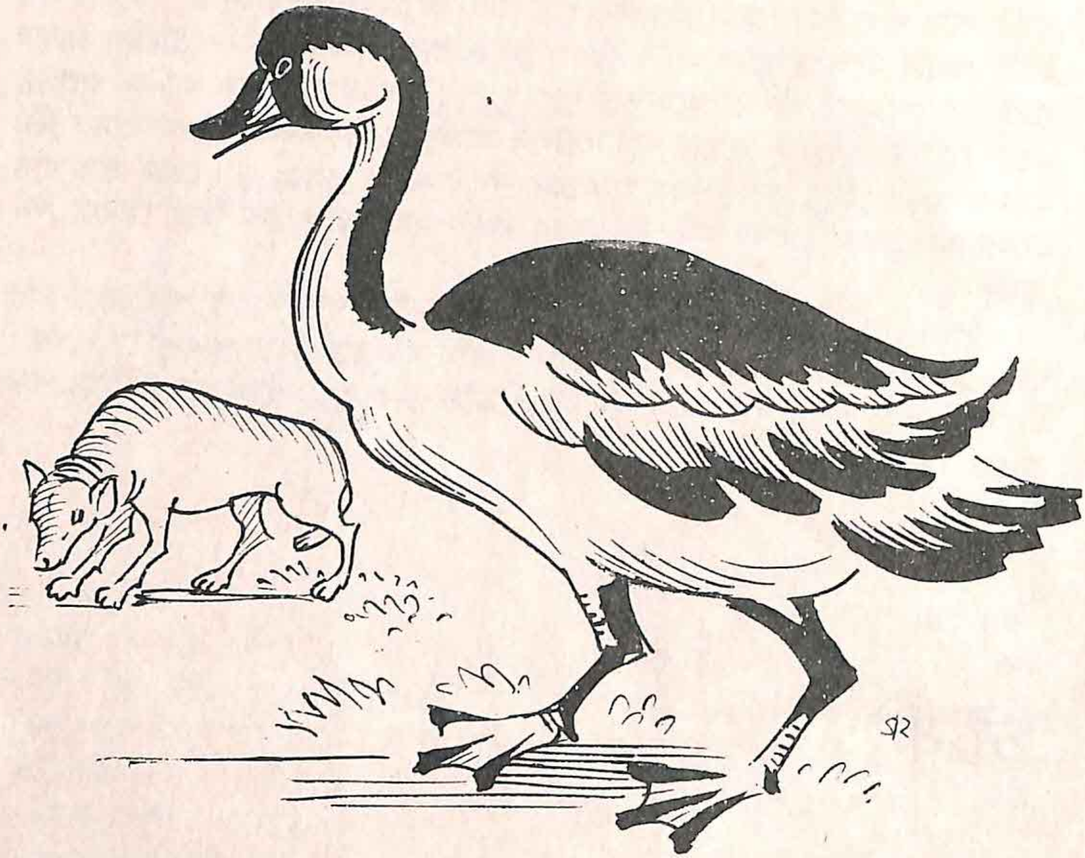
রেখেছিলেন,চন্দন-কুন্দনের কাহিনী শুনে তাড়াতাড়ি সেটা এনে দিলেন। চিঁড়ে ভাজা, ঘুগ্‌নী আর পায়সের সঙ্গে ধোঁয়া-গন্ধি চা—আঃ কি চমৎকার যে লাগল খেতে ! এত হাসি খেলার মধ্যেও পুঁটের মনটা থেকে থেকে পায়সের জন্য কেঁদে উঠছিল, এবার চেটেপুটে পেটভরে পায়স খেয়ে তার দুঃখ ঘুচল। বাবা-মায়ের সঙ্গে খানিক গল্পসল্প করে, একে একে সবাই যে যার ঘরে ফিরল ; আজকের পিক্‌নিক্‌টা তাদের অনেক দিন মনে থাকবে। চন্দন আর কুন্দনও আজকের দিনটা সহজে ভুলবে না। রোজ তারা ঘাস ছোলা শাক পাতা এইসব খায়, আজকের মত মজার ভোজ তো আর কোনো দিন খায়নি।

চন্দন তো পানের স্বাদ ভুলেই গিয়েছিল, অনেকদিন পরে আবার পান খেয়ে তার ভারি লোভ হয়েছে—রোজ সে মায়ের কাছে এসে মস্ত বড় একটা পান খেয়ে যাচ্ছে। মনু বলে,'ওরে চন্দন, অমন করে যে বনের দিকে তাকাস, সেখানে তোকে মিঠা পান সেজে দেবে কে ?'

ছুট্‌কী

মাথা হেঁট করে, লেজ গুটিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছুট্‌কী। এই শীতে লছমন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল চান করাতে, সে ছুটে দিদিমণির কাছে পালিয়ে এসেছিল ; না হয় দিদিমণির বিছানা-ঢাকা ফুলকাটা চাদরটাতে একটু কাদা লেগে গিয়েছিল, তাই তাকে 'পেত্‌নী কুকুর' ! বলে কলার ধরে খাট থেকে নামিয়ে দেবে দিদিমণি ? বেশ, আর সে কোনদিন ঘরে ঢুকবে না—বাগানেই থাকবে।

ঝাউগাছের তলায়, পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে সে বেশ বড় একটা গর্ত করল, ফুলের কেয়ারীটা তচনচ হয়ে গেল, সবাই বকবে ? ই-স্‌-স্‌ ! ওদের আদুরে 'সিকান্দার' যখন গাছ নষ্ট করে, তখন তো কেউ কিছু বলে না ? ভাল এক আপদ জুটেছে, এই সিকান্দার—দিব্য মোটাসোটা পাতিহাঁস, কে যেন রোস্ট খাবার জন্য দিয়েছিল, তা দিদিমণির খোকা খুকু ডোডো আর পুপু বলল, 'না-না, ওকে খাবো না। ও যে পোষা হাঁস ! দেখছ না, কেমন ডাকলে কাছে আসছে, হাত থেকে খাবার খাচ্ছে—ওকে আমরা পুষবো।' ওর নাম রাখল 'সিকান্দার'। ব্যস ! সেই থেকে হাঁসারাম যেন 'শেখ্‌ সিকান্দার বাদশা' হয়ে গেছে—সারা বাগানটা যেন তারই রাজ্যি—ছুট্‌কী কেউ নয়। বাগানে সেই



যে গোল চৌবাচ্চাটা ছিল লাল মাছের জন্য, মাছগুলো তো কবে মরে গিয়েছে, সেটা এখন জল ভরে ঝাঁঝিশেওলা কত কিছু দিয়ে, হাঁস পুকুর হয়েছে—তাতে সাঁতার কাটছে। সারাদিন প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে বাগানে ঘুরে ফল-পাকড়, পোকা-মাকড়, কেঁচো-বিছে, গেঁড়ি-গুগলি, যা দেখছে তাই গিলছে। ওর জন্য রোজ বাজার থেকে কুচোচিংড়ি আসে, তবু সেদিন ছুট্‌কীর ভাগের মাংস ভাত খেতে এসেছিল—'ভৌঃ' করে তেড়ে যেতেই একেবারে খাড়া হয়ে, ডানা ঝাপটিয়ে, লম্বা গলা বাড়িয়ে, হাঁ করে ঠোক্‌রাতে এল ! যাক, এখন ওটা এদিকে নেই—এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে, তারপর মাথা-পা-লেজ গুটিয়ে গোল হয়ে সেই নরম গরম মাটিতে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল ছুট্‌কী। খানিক পরেই, প্যাঁক্-প্যাঁক্ শব্দে চম্‌কিয়ে উঠে চেয়ে দেখল—হেলতে দুলতে সিকান্দার আসছে, তার পিছনে আরেকটা হাঁস। ডোডো পুপুও ছুটে এল, দিদিমণি তাদের বললেন, 'সিকান্দার বেচারা একলা একলা থাকে, ওর জন্য একটা সাথী কিনে আনলাম।' নতুন হাঁসটা কিন্তু ওদের সঙ্গে ভাব করল না—ভয়ে, একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

কেউ কোথাও নাই, পা টিপে টিপে ছুট্‌কী ঝোপের কাছে গেল—নতুন হাঁসটা সিকান্দারের চেয়ে অনেক ছোট, মাথায় গলায় ডানায় সে রকম রঙের বাহারও নেই, কেমন বোকা বোকা ভালমানুষের মত চেহারা—দুই ধমক দিয়েই বোধ হয় ওটাকে তাড়ানো যাবে। ছুট্‌কীকে দেখেই হাঁসটা ভয়ে 'পড়ি-কি-মরি' হয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলল—জলে নামবার আগেই ছুট্‌কী চৌবাচ্চায় উঠে সেটার লেজ কামড়ে ধরল—অমনি কোথা থেকে সিকান্দার 'প্যাঁক্-প্যাঁক' করে এসে, মারল এক ঠোক্কর !

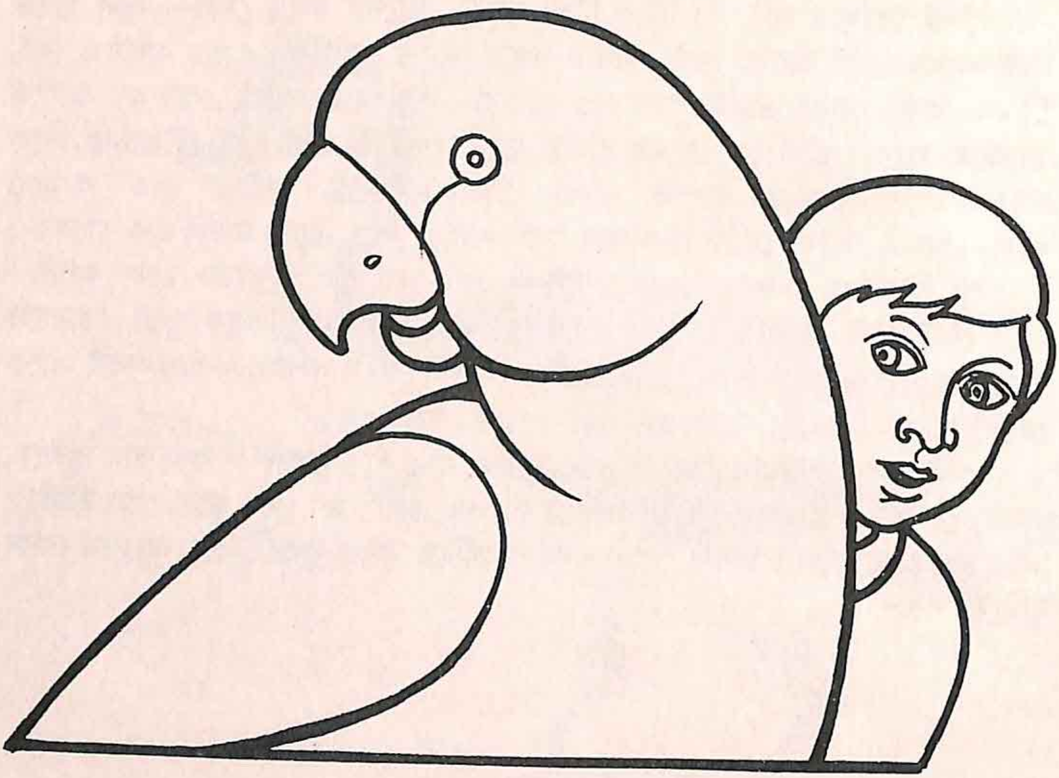
পা পিছলিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে ছুট্‌কী একেবারে হাঁস পুকুরের মধ্যে ঝপাৎ !

'কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-উ-উ' শুনে সবাই ছুটে এল—লছমন ছুট্‌কীকে তুলে, তোয়ালে দিয়ে মুছে, রোদে বেঁধে দিল। রোদে বসে ঠকঠক করে সে কাঁপছে—আর সবাই তাকে দেখে হাসছে ! দুঃখে, অপমানে তার চোখে জল এল।

একটু পরেই দিদিমণি এসে 'বে-চা-রা ছুট্‌কী, বড্ড শীত করছে ?' বলে হাত বুলিয়ে, একটুকরো কম্বল এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন, তখনি সব দুঃখ ভুলে গেল ছুট্‌কী। দিদিমণির হাতটা চেটে আবার লেজ-পা-মাথা গুটিয়ে 'কুকুর-কুণ্ডলী' হয়ে আরামে রোদে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভুট্টা

ফুলগাছে জল দিতে দিতে খুকনু হঠাৎ বলে উঠল 'ও দাদা দেখ দেখ—ঐ যে ভুট্টা গাছে !' চট করে খুকনুকে গোলাপগাছটার পিছনে টেনে নিয়ে খোকন ফিস্‌ফিস্ করে বলল 'চুপ ! আমাদের সাড়া পেলেই পালাবে।' ছোট বাগান—কয়েকটা ফুলের গাছ, কিছু শাক-সবজী,একসারি ভুট্টা গাছ ; সবে একটা গাছে একটা কচি ভুট্টা হয়েছে, ভুট্টাপাতার মতই সবুজ দুটো টিয়াপাখি সেই গাছে বসেছে। পা দিয়ে গাছের ডালটা আঁকড়িয়ে ধরে, লাল ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে দুজনে ভুট্টার দানা ছাড়িয়ে খাচ্ছে। গোলাপ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে দুই ভাইবোন চুপি চুপি দেখছে। ওদিক থেকে শ্যামাঝিও মস্ত একটা ঝাড়ন হাতে নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে—গাছের আড়াল দিয়ে গুটি গুটি এসে ঝপ করে সে ঝাড়ন চাপা দিয়ে দিল দুটোকে। একটা কেমন করে ফস্‌কিয়ে উড়ে পালাল, অন্যটাকে শ্যামা কায়দা করে ঝাড়ন দিয়ে মুড়ে ধরে ফেলল। ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করে পাখিটা চেঁচাল, খোকন খুকনু আনন্দে কলরব করে ছুটে এল,



গোলমাল শুনে মাও বেরিয়ে এলেন।

কিছুদিন আগে ওদের পোষা ময়না পাখিটা মরে গিয়েছে, খালি খাঁচাটা এক কোণে পড়েছিল, তারই মধ্যে অনেক কষ্টে—শ্যামা টিয়াপাখিকে ঢুকিয়ে দিল। শ্যামার আঙুল কামড়িয়ে রক্ত বের করে দিয়ে, চেঁচিয়ে, ডানা ঝাপটিয়ে, ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক টেনে, পালাবার অনেক চেষ্টা করেও যখন পারল না তখন মুখ গুঁজে চোখ বুজে চুপটি করে বসে রইল, সারাদিন কিছুই খেল না। মা বললেন, 'ওর মনে দুঃখ হয়েছে রাগ হয়েছে, তাই এখন অমন করছে—আদর যত্ন করলে কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' পরদিন টিয়াপাখি কপকপ করে ভুট্টা খেল, তারপর থেকে কিছু কিছু খেতে শুরু করল। কেউ কাছে গেলে ভয় পায়, রাগ করে—খাবার রেখে চলে এলে খানিক পরে নিজেই খায়। ছোলা ছাতু ভুট্টা খেতেই সবচেয়ে ভালবাসে তাই ওর নাম রাখা হল 'ভুট্টু'।

একে একে বাড়ির লোকদের সবাইকে ভুট্টু চিনল, শুধু শ্যামাকে দেখলেই রাগে ফুলে ওঠে! খোকন বলে 'শ্যামাদিদি তুমিই কিনা ওকে ধরে খাঁচায় পুরেছিলে তাই তোমার উপর এত রাগ।' শ্যামাও ভুট্টুর উপরে ভীষণ চটে গিয়েছে। ভুট্টু নাকি আরেকটু হলেই ওর আঙুলটা খেয়ে ফেলেছিল! কিছুদিন পরে একটি দুটি করে কথা বলতে শিখল ভুট্টু। কেমন করে কথা বলে তা দেখতে খোকন খুকনুর ভারি মজা লাগে। নতুন কথা শিখবার সময় আগে ঘাড় কাৎ করে মন দিয়ে কথাটা বারবার শোনে,

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ছোট্ট জিভটি নেড়ে নেড়ে মনে মনে সেটা আওড়ায়,গলার ভিতরে আস্তে আস্তে শব্দ করে,তারপর হঠাৎ জোরে কথা বলে ওঠে। ভুট্টু শিস দেয়, অচেনা লোক দেখলেই বলে 'কে ? কে গো ?' খিদে পেলেই ডাকে 'খোঁ-কো-ন।' খোকনের সাথেই সবচেয়ে ওর ভাব।

ছুটির ঠিক আগেই, হঠাৎ একদিন খোকনের গায়ে মাথায় ব্যথা হয়ে বেশ জ্বর হ'ল—তারপর সারা গায়ে ছোট্ট ছোট্ট ফোস্কার মত 'জল-বসন্ত' বেরোল ! ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গেল—অসুখটা হল তো এমনিই অসময়ে হ'ল ? সারা ছুটিটা একদম মাটি হয়ে গেল ! কদিন ভুগে অসুখটা সারল, কিন্তু তার পরেও আরো সাত দিন ঘর থেকে বেরোন নিষেধ ! ছোঁয়াচে অসুখ, মা বাবা ছাড়া কেউ ওর ঘরে ঢোকে না—বন্ধুরা বাইরে থেকে দেখে গেল। পুজো এসে গিয়েছে, ওরা সবাই কেমন মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠাকুর দেখছে, মেলায় জিনিস কিনছে, চারদিকে আলো বাজনা গান, কত ধুমধাম, লোকজনের কোলাহল—আর খোকন কিনা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল ! অসুখের কষ্টের চেয়েও সেই কষ্ট বেশী মনে হয়। ওর মন ভাল রাখার জন্য মা কাছে কাছেই থাকেন, বাবা কত নতুন বই এনে দিয়েছেন, রেডিওটা ওর ঘরেই রয়েছে, ভুট্টুর খাঁচাটা ঘরের জানালার সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর সাথী হবে বলে, তবু মাঝে মাঝে বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়।

ভুট্টুরও কি যে হয়েছে আজকাল—ভাল করে খায় না, রোগা হয়ে যাচ্ছে ; ভোরবেলায় কত পাখি ডাকে, শিস দেয়, ভুট্টু আগের মত ডাকাডাকি করে না, শিস দেয় না—মনমরা হয়ে চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ভারি ছটফট করে, শরতের নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে যায়, ভুট্টু ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে থাকে। খোকন যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারে, বলে 'কিরে ভুট্টু, তোরও মন কেমন করছে ? বাইরে যেতে ভী-ষণ ইচ্ছা করছে, না ? তুই খাঁচার ভিতর বন্দী, আর আমিও ঘরের ভিতর বন্দী।'

একদিন সকালে 'কিঁই কিঁই কিঁ-ক্' শব্দ শুনে খোকন জানলা দিয়ে দেখল, নীল আকাশের গায়ে সবুজ ডানা মেলে একঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে চলেছে—কি সুন্দর যে লাগছে দেখতে ! হঠাৎ একটা ঝটাপট্ শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখে, খাঁচার ভিতরে ভুট্টু যেন পাগল হয়ে উঠেছে ! পাখা ঝাপটিয়ে, মাথা ঠুকে, কামড়িয়ে, কাতর চিৎকার করে বাইরে যাবার জন্য এমন আকুলি বিকুলি করছে, যেন ছাড়া না পেলে সে এখনি মরে যাবে ! খোকন আর সইতে পারল না—আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। বারান্দা থেকে খুক্নু চেঁচিয়ে উঠল 'মা ! ওমা ! ভুট্টু খাঁচা খুলে বেরিয়ে পড়েছে !' খোকন বলল 'না, আমি ওকে খুলে দিয়েছি !' 'কেন দিলে ? পালিয়ে যাবে যে ! মা এখানে নেই, আমার যে ধরতে ভয় করে ! ওকে ধর ; উড়ে যাবে এখনি !' 'যাক্ ! ও উড়ে যেতেই চাইছে—খাঁচায় থাকতে ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।' খাঁচা থেকে বেরিয়ে ভুট্টু কয়েকবার পাখা ঝাপটাল, তারপর ডানা মেলে আকাশে উড়ল—তার সবুজ গায়ে

সোনালী রোদ ঝলমল করে উঠল, মনের আনন্দে গলা ছেড়ে ডাকতে ডাকতে সে উড়ে চলল সেই দিকে, যেদিকে তার দলের পাখিরা উড়ে গিয়েছে। যতদূর দেখা গেল, খোকন তার দিকে চেয়ে রইল—খুক্‌নুর চোখ ছল ছল, খোকনের চোখে মুখে বেশ খুসি-খুসি ভাব, যেন খুব ভাল একটা কাজ করেছে।

বাবা মাও বললেন যে ভুট্টুর যখন খাঁচার ভিতরে মন টিকছিল না, বাইরে যাবার জন্য এত কাতর হয়েছিল, তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে ভালই হয়েছে। তবু ভুট্টু কেমন মজা করতো, কি সুন্দর কথা বলতো, সেই কথাই সবার মুখে। শুধু শ্যামা বলল 'হ—তোভাগা পাখি। নেমোক্ হারাম পাখি! উড়ে গেছে তো আপদ গেছে!'

ক'দিন পরে, হঠাৎ ভোরবেলায় চম্‌কিয়ে ঘুম ভেঙে গেল খোকনের—কে ডাকে? এ যে তার অতি চেনা, ভারি আদরের ডাক 'খোঁ-কোঁন—খোঁকোঁ-ন'! ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই দেখল, আরে! ঐ তো ভুট্টু জানলায় বসে আছে! ভুট্টু এসেছে শুনে সবাই ছুটে এল, মা খাবার আনতে গেলেন, খুক্‌নু তাড়াতাড়ি খাঁচাটা আনছিল, খোকন বলল 'না না, ওকে আর খাঁচায় পুরো না।' বাবা মাও বললেন 'ও নিজেই এসেছে, ধরতে গেলে হয়তো আর আসবে না।' দুধ কলা ভুট্টা খেয়ে, খোকনের কাঁধে বসে কিচিমিচি কত কিছু বলে, খানিক পরে ভুট্টু আবার উড়ে গেল। ধরা না দিলেও, ভুট্টু ওদের ভোলেনি—ওরা রোজ তার জন্য খাবার রেখে দেয়, প্রায় রোজই সে এসে 'খোঁকোঁন' বলে ডাকে, খাবার খেয়ে, কথা বলে, আবার উড়ে চলে যায়।

বাদল দিনে

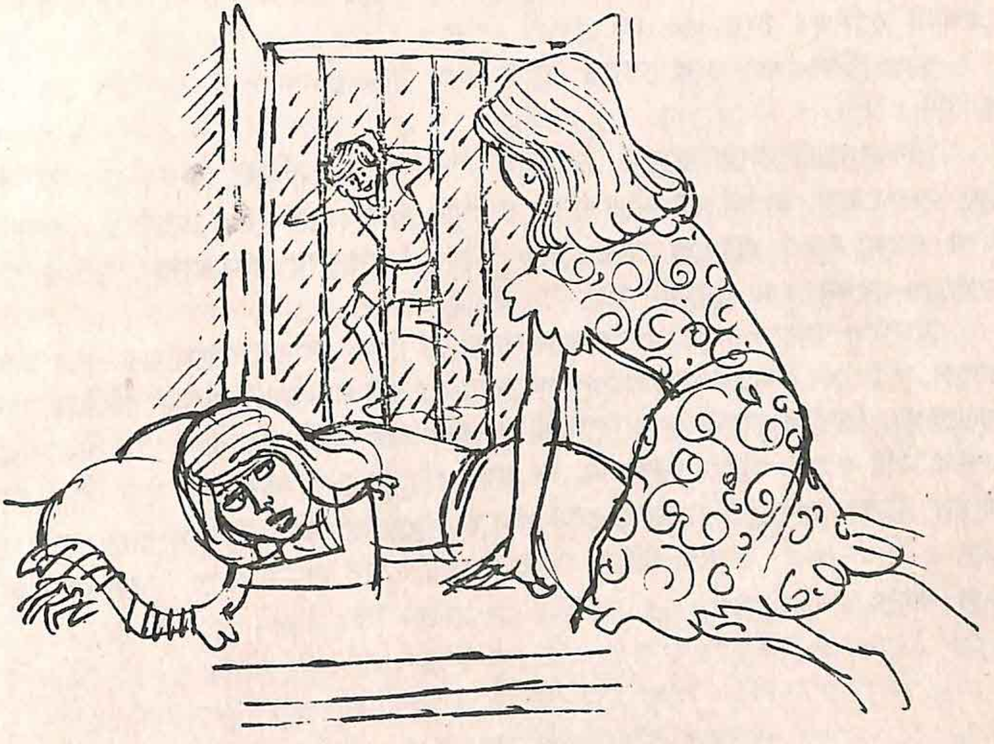
সকালে চোখ মেলেই আবার চোখ বুজে ফেলল মীনা—উঃ—আর পারা যায় না। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হল, তবু এখনও টিপ্-টিপ্-টিপ্! পাশে বসে বীণা গুনগুন করে গাইছিল 'সকাল বেলার বাদল আঁধারে', মীনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল 'এমন বিচ্ছিরি দিনেও তোর গান পায় দিদি? আমার তো কান্না পায়।' বীণা হেসে বলল 'তুই যে বাদলা দিন দুচোখে দেখতে পারিস না তাই তোর কান্না পায়, আমি বাদল ভালবাসি তাই আমার গান পায়। নে, এখন উঠে মুখ ধুয়ে চা খাবি চল্।'

চা খেতে বসে ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামল। ছোট ভাই নন্দ হাততালি দিয়ে বলল 'বেশ মজা! আজ ইস্কুল যেতে হবে না—আয় বৃষ্টি হে—নে, বিস্কুট দিব মে—নে।' মীনা

বলল 'যা বিষ্টি ঝরে যা—মাখন রুটি গরম চা।'

(নন্দ) 'আয় মেঘ ঝেঁ—পে, দুধ দিব মে—পে'

(মীনা) 'যারে মেঘ উড়ে যা—দেশ ছেড়ে দূরে যা'



মেঘ জল যাই হোক, বাবা ঠিক সময়ে অফিস যাবেন—তাঁর অনেক কাজ। রাস্তায় জল জমেছে, ঝি রাঁধুনীর দেখা নাই, মা তাড়াতাড়ি স্টোভে রান্না চাপালেন।

নন্দ কেমন মজা করে বৃষ্টিতে স্নান করল, মীনার কাল একটু কাশি হয়েছিল বলে, ভিজতে পেল না, তাই মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। মায়ের রান্না চমৎকার খিচুড়ি আলুভাজা, ডিমের বড়া খেয়ে, তবে মনটা আবার ভাল হ'ল!

দুপুরে, মা শুয়ে বই পড়ছেন, বীণা সেলাই করছে, নন্দ কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাচ্ছে, মীনার কোন কিছুতেই মন বসছে না—সেলাই হাতে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে রেখে দিল; নন্দর পাশে বসে দুচারটা নৌকো ভাসিয়েই 'দূর ছাই'! বলে উঠে পড়ল; একটা গল্পের বই নিয়ে বসল।—যেই না গল্পের ছোট্ট মেয়েটি গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলল, অমনি বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর মুখখানা হাঁড়িপানা করে জানালার ধারে বসে রইল।

সামনে রাস্তার ধারে ধুলোমাখা রোদেপোড়া গাছটা বৃষ্টির জলে স্নান করে তাজা হয়েছে, সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছে গোল গোল, ফুরফুরে, হলদে কদমফুল ! গাছতলায় কত ময়লা জমেছিল, সেসব এখন সবুজ ঘাসে ঢেকে গিয়েছে ; চুষে ফেলে দেওয়া আমের আঁটি থেকে ছোট চারা বেরিয়েছে, কচি কচি লালা পাতা চিক্‌চিক্‌ করছে, শেওলাপড়া পাঁচিলটা মনে হ'ল যেন সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া—দেখতে দেখতে হাঁড়ি মুখখানা হাসিমুখ হয়ে এল।

হঠাৎ খিল খিল করে জোরে হেসে উঠল মীনা। নন্দ ছুটে এল 'কি হল ভাই ছোটদি ?'

'একটা ছোট্ট ছেলে সামনের রোয়াকে বসে কি যেন খাচ্ছিল, ঐ বড় ছেলেটা তার হাত থেকে খাবারটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে, পা পিছলে—হিঃ-হিঃ-হিঃ'—জানালা দিয়ে দেখে নন্দও হো-হো করে হেসে উঠল, 'একেবারে কাদামাখা ভূত ! বেশ হয়েছে—যেমন কর্ম তেমনি ফল !'

বিকেলে আবার কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল ; বাদল মেঘে গুরু-গুরু মাদল বাজল, শুরু হল ঝোড়ো হাওয়ার পাগলা নাচন। বৃষ্টি নামবার ঠিক আগেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। ভিতরে ঢুকেই বেশ লোভনীয় একটা গন্ধ তাঁর নাকে এল, আর কানে এল একটা মিষ্টি গানের সুর। দেখলেন, মা গরম হালুয়া তৈরী করছেন, আর বীণা মীনা চায়ের টেবিল সাজাতে সাজাতে গান করছে—'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে-এ-এ-এ-এ-এ—।' নন্দ গাইতে পারে না, সে ওদের গানের তালে তালে হেলেদুলে নৃত্য করছে !

হাসু

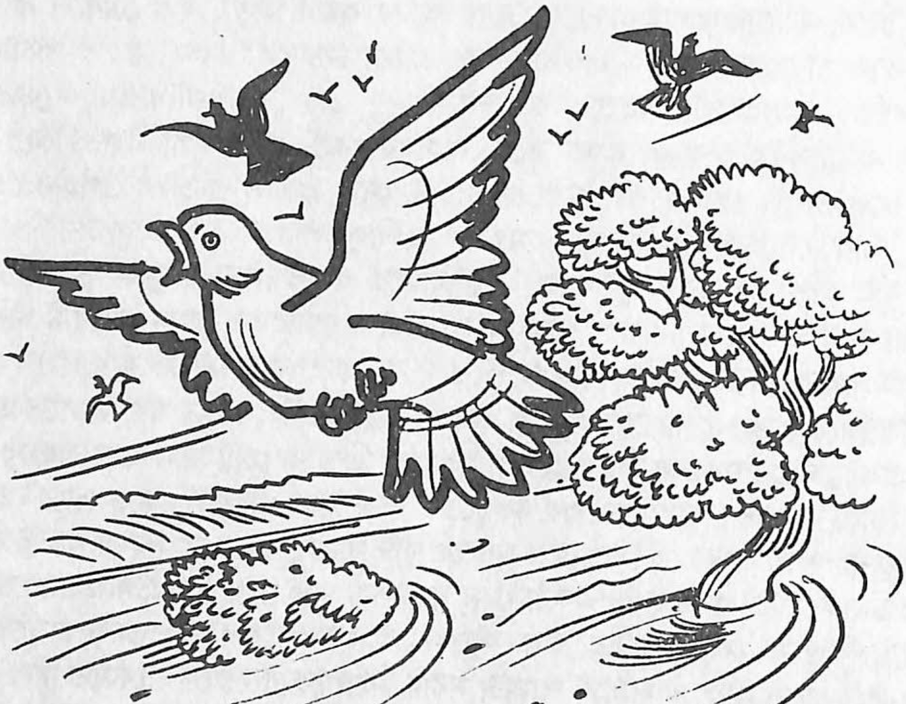
হাসু পুতুলকে পাশে নিয়ে মিতু ঘুমিয়েছিল, কপালে চুমু দিয়ে মা ডাকলেন 'মিতুমা, ওঠ—আজ যে তোমার জন্মদিন।' মিতুর বুকের উপর ওটা কি ? ওমা, কি সুন্দর ডলিপুতুল ! হাসুও খুব মিষ্টি দেখতে, কিন্তু নতুন পুতুলটা আরো সুন্দর আর মস্ত বড় ! পুতুল কোলে নাচতে নাচতে মিতু খেতে গেল। দেখল, সকাল থেকেই রান্না-বান্না ঘর সাজানো-গোছানোর ধুম লেগে গিয়েছে।

বিকেলে জন্মদিনের 'পার্টি'—সব ঠিকঠাক ফিটফাট, মিতুও নতুন পোশাকে সেজেগুজে তৈরী। একে একে মাসিপিসি ভাইবোন খেলার সাথীরা সবাই এল উপহার

হাতে নিয়ে, বড়দের প্রণাম আর ছোটদের আদর করল মিতু ; বড় টেবিলে কতরকম ভাল ভাল খাবার সাজানো—মাঝখানে মস্ত একটা চকোলেট-কেক, তাতে পাঁচটা লাল মোমবাতি—মিতুর পাঁচ বছরের জন্মদিন কিনা, তাই। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, নাচ-গান, হাসি-হৈচৈ করে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল—পার্টি শেষ করে সবাই বাড়ি চলে গেল। খেলনা, বই, টফি, চকোলেট, জামা, রুমাল, কত যে উপহার পেয়েছে মিতু, আর পেয়েছে—আরেকটা চমৎকার ডলিপুতুল !

দুই পাশে দুই নতুন পুতুলকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মিতু, হাসুকে ভুলেই গেল। বেচারা হাসু একলা জানালার তাকে বসে রইল। শেষরাতে এমন ঝড়বৃষ্টি এল, সে জানালা থেকে নিচে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে গেল, তারপর নর্দমা দিয়ে ভেসে পিছনের গলিতে গিয়ে পড়ল। গলিতে হাঁটুজল, দুধারে ছোট ছোট খোলার ঘর, ভাসতে ভাসতে হাসু একটা ঘরের দরজায় গিয়ে ঠেকল। ঘরের ভিতরে ছোট্ট উমা তার মায়ের পাশে শুয়ে আছে ; ক'দিন ধরে তার জ্বর, কিছুতেই সারছে না ! কিছুই খেতে পারে না, ভাল ঘুম হয় না, খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। সকালে বৃষ্টি থামল, উমার মা দরজা খুলেই হাসুকে দেখে চমকিয়ে উঠল—এমনি একটা মেম্ পুতুলের ভারি সাধ উমার, কতবার সে মাকে বলেছে, কিন্তু মা যে বড় গরীব, অমন পুতুল কোথায় পাবে ! তাড়াতাড়ি হাসুকে তুলে নিয়ে, ধুয়ে-মুছে, তার কাদামাখা জামাটা সবান দিয়ে কেচে রোদে শুকোতে দিল—উমা শুয়েছিল, টের পেল না। বিকালে হাসুকে পোশাক পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, ঝিটফাট করে নিল।

উমা শুয়ে আছে, কিছুই ভাল লাগছে না, তার মা এসে বলল 'একবার চোখ বোজ দেখি উমা—বেশ মজা হবে !' উমা চোখ বুজতেই ঝুপ্ করে হাসুকে তার কোলে ফেলে দিল। 'ওমা কি সুন্দর ! কোথায় পেলে মা ?' মা হেসে বলল 'ভগবান জুটিয়ে দিলেন ! সকালে দোর খুলেই দেখি, কোথা থেকে যেন ভেসে এসে আমাদের দুয়ারে ঠেকেছে।' ওর কি নাম রাখবো ? কেমন হাসি-হাসি মুখ, ওকে হাসু বলে ডাকবো, কেমন ?' হাসুর মনে ভারি দুঃখ হয়েছিল, এবার মনটা খুসি হয়ে গেল। হাসুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল উমা—এমন ভাল ঘুম অনেকদিন হয়নি তার। সকালে মা গায়ে হাত দিয়ে দেখল, উমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে !



জব্দ নদী

সামনেই পুজোর ছুটি। মণ্টুর বাবা বললেন, 'এবার বেশ লম্বা ছুটি পাচ্ছি, কিছু টাকাও পেয়েছি। অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে একবার সবাই মিলে বেশ ভাল করে অনেক দূর বেড়িয়ে আসবো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে এ সময়ে বেড়াবার জন্য অত টাকা খরচ না করে, সে টাকাটা বাংলাদেশের সাহায্যে দিলেই ভাল হয়, না ?'

মণ্টুর মা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই ভাল হবে। আজ পাড়ার ছেলেরা পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল। তারাও বলেছে এবার পুজোয় বেশী ধুমধাম করবে না, যত টাকা তুলবে তার বেশীর ভাগই বাংলাদেশের জন্য দেবে। আমাদের পুজোর কাপড়েও এবার কম খরচ করব, কেমন ? মণ্টু, মায়া, তোমরা কি বল ?'

মায়া আর মণ্টু তাতে খুব রাজি, কারণ বাংলাদেশের দুঃখের কথা ত তারা শুনেছে !

বাবা বললেন ;'খুব ভাল কথা ! লাখ লাখ লোক সব হারিয়ে আমাদের কাছে চলে

এসেছে। এদের বাঁচাতে কত কোটি কোটি টাকার দরকার। সারা দেশের লোক সাহায্য করছে, বিদেশ থেকেও কত সাহায্য এসেছে। সকলেরই উচিত যে যতটুকু পারে ততটুকু দেওয়া।'

মণ্টু বলল, 'ওরা কতদিনে আবার নিজের দেশে ফিরতে পারবে বাবা ? বাংলাদেশের জয় হবে ত ?'

বাবা বললেন, 'হবে, নিশ্চয় হবে। ওরা যে ন্যায়-যুদ্ধ করছে। ওদের ওপর ভীষণ অন্যায় আর অত্যাচার করা হয়েছে, তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ওরা প্রাণপণ লড়ছে। সেই দুষ্টু নদী আর বনের পাখির গল্প জানো ত ?—'

মণ্টু, মায়া একসঙ্গে বলে উঠল, 'কি ? কি গল্প বাবা ? বল না !'

বাবা বললেন, 'তবে শোন, ভারি সুন্দর একটা বনের মধ্যে পাখিদের রাজ্য। ছোট বড় কতরকমের, কত রঙবেরঙের পাখি সেখানে গাছে বাসা বাঁধে, বনের ফলমূল, পোকামাকড় খায়, মনের আনন্দে গান গায়, আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, নদী বিলের জলে ভেসে বেড়ায় !

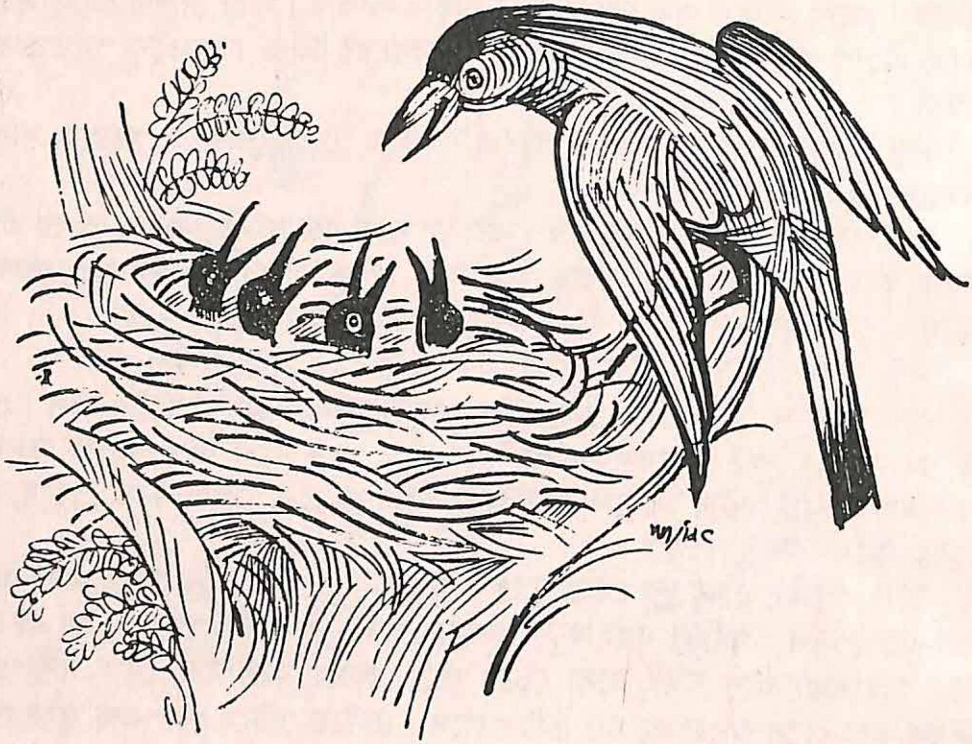
হঠাৎ একদিন কোন দূর থেকে দুরন্ত একটা নদী একেবারে হুড়মুড়িয়ে সেই বনের মধ্যে এসে পড়ল। পাখিরা যতই বলে, 'আহাহা, করছ কি ? আমাদের বন যে নষ্ট হয়ে যাবে, গাছগুলো পড়ে যাবে, বাসা ভেঙ্গে যাবে, আমরা মরে যাব যে !' নদী ততই খলখল করে হেসে আরো বড় বড় ঢেউ তোলে ! ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝোপঝাড় ডুবে গেল, গাছপালা হেলে পড়ল, কত কত পাখির বাসা ভেঙ্গে পড়ল, কত ছানা ভেসে গেল—পাখিদের কান্নায় আকাশ ভরে উঠল !

আর সইতে না পেরে পাখিরা বলল, 'নাঃ, এমনি করে ত আর চলে না। যেমন করে হোক এই নদীকে রুখতে হবে।'

তারপর তারা করল কি, দেশের যেখানে যত পাখি ছিল, ছোটবড় মাঝারি, সবাই নিজের সাধ্যমত পাথর বয়ে নিয়ে আকাশে উড়ল। কালবৈশাখী ঝড়ের মত সোঁও-সোঁও শব্দে আকাশ ছেয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে পাখি আসছে ত আসছেই, দিন নেই রাত নেই, বিশ্রাম নেই—কেবল টুপটাপ, ঝুপঝাপ নদীর বুকে পাথর ফেলছে ত ফেলছেই। দেখতে দেখতে জমাট পাথরে নদীর বুক ভরাট হয়ে গেল ! অমন যে দুর্দান্ত নদী সে তখন ঠাণ্ডা হয়ে, মুখটি চুন করে আস্তে আস্তে নিজের পাখিরা জায়গায় ফিরে চলে গেল।

জল চলে গেলে আবার বনের শ্রী ফিরে এল, গাছে গাছে ফুল ফুটল, ফল ধরল, পাখিরা আবার নতুন বাসা বাঁধল, মনের সুখে আবার গান গাইতে লাগল।

এমনি করে সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করে অত্যাচারের স্রোতকে রুখতে হবে। তখন বাংলাদেশের মানুষ আবার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভাঙ্গা ঘরবাড়ি নতুন করে বানাবে, রাস্তাঘাট মেরামত করবে, নতুন ফসল ফলাবে, সোনার বাংলা আবার নতুন করে গড়ে তুলবে।



"হিজিবিজি কাগের ছানা"

'তাইতো !' ছোট কাগ্-মা মাথা চুলকিয়ে বলল 'তাইতো । এটা কিরকম হল ? তিনটে ডিম পাড়লুম, আর ছানা হল চারটে । কি করে হয় ?' কাগদের সরদারনী ধমক দিয়ে বলল 'হতেই পারে না । তুই একটা বোকা, গুনতে জানিস না, তাই হিসেবে গোল করেছিস ।' নিম গাছের ডালে ডালে যত কাগের বাসা ছিল সব কাগগিন্নীরা বলে উঠল 'কি বোকা । কি বোকা ।' কাগ-মা বয়সে সবার ছোট, তাই বকুনি খেয়ে চুপ করে রইল ।

ছোট্ট রোগা চারটা ছানা—চোখ ফোটেনি, পালক ওঠেনি, কিছুই করতে পারে না, খালি এতোবড় হাঁ করে চেঁচায় । কাগ-মা সারাদিন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে নানারকম খাবার এনে ওদের মুখে পুরে দেয়, সারারাত ওদের নিজের ডানার তলায় ঢেকে রেখে ঘুমায় । খেয়েদেয়ে ছানাগুলো একটু বড় হ'ল—চোখ ফুটল, পালক গজাল, নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল । তিনটা ছানার গায়ের রং সব কাগদের মতই—লেজ পিঠ মাথা কালো, বুক

পেট গলা ছাইরং—আরেকটার রং আগাগোড়া কুচকুচে কালো ; তিনজনের চক্‌চকে কালো চোখ, সেটার চোখদুটো টক্‌টকে লাল—গলার আওয়াজটাও তার একটু অন্যরকম।

ছানাটাকে দেখেই তো কাগ পাড়ার কাগরা সবাই চেঁচামেচি করে উঠল—'এ কি ! এই ভূত ছানাটা কোথা থেকে এলরে ? এটাতো আমাদের কারো ছানা নয় ।' হিজিবিজি কাগের ছানা কাদের ছানা কেউ জানে না, সবাই বলে 'আমার ছা না ।' সরদারনী বলল 'এটা কাগের ছানাই নয় ।' তবে কিসের ছানা ? কি করে এখানে এল ? খানিক ভেবে সরদারনী বলল 'আমার কি মনে হয়, জানো ? সেই যে কিছুদিন আগে বকুল গাছে সেই কালো পাখীটা এসেছিল, রাতদিন চেঁচিয়ে কান ঝালা-পালা করে দিত ।—এ তারই কারসাজি । সেটাকে ঐ কাগ্-মায়ের বাসার কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলাম ; ও যখন খাবার খুঁজতে বেরোত তখন সে কোন ফাঁকে চোরের মত চুপি চুপি এসে, ওর বাসায় ডিম পেড়ে পালিয়েছে !' সবাই বলল 'বটে ! বটে ! দে, ঐ চোরের ছানাটাকে এখনি দূর করে দে !'

কাগ-মা বলল 'আহা, থাক্‌না ! ও বেচারার তো কোন দোষ নেই । এখন ছোট আছে, বড় হলে ও আপনিই উড়ে চলে যাবে ।' কেউ তার কথা শুনল না, কা-কা করে চারদিক থেকে মারতে গেল ছানাটাকে । বেচারা উড়তে জানে না তো, পালাতে গিয়ে ধপ্ করে পড়ে গেল—পাশেই, জিতুদের বাড়ির উঠোনে । জিতুদের ভুলো কুকুরটা অমনি ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল । ভাগ্যে জিতু ছিল কাছে । সে চট্ করে ভুলোকে ধরে বেঁধে দিল, আর ছানাটাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল !

জিতুর বাবা দেখেই বললেন 'আরে, এযে কোকিলের ছানা ! কোথায় পেলে ?' 'ঐ নিমগাছে কাগের বাসা থেকে পড়েছে ।' 'হাঁ, হাঁ, শুনেছি কোকিলেরা নাকি বাসা বাঁধে না, লুকিয়ে কাগের বাসায় ডিম পেড়ে যায়—কাগরা নিজের ডিম মনে করে, কোকিলের ডিমে তা দেয় ।'

মা মহাখুসি হয়ে বললেন 'ওটাকে আমরা পুষবো—বড় হলে কেমন সুন্দর ডাকবে ।' তখনই সুন্দর একটা খাঁচা এল কোকিলছানার জন্য । ছানাটা আগে ভয় পেয়েছিল, এখন মাকে আর জিতুকে বেশ চেনে । মা রোজ নিজে তাকে খাওয়ান, কত আদর করেন ।

কাগরা দেখে হাসে আর বলে, 'মানুষগুলো কি বোকা ! আমরা একটু কা-কা করলেই রেগে বলে—দূর হ ! দূর হ ! আর ঐ কেলে পাখীটার কান-ফাটানো কু-উ কু-উ শুনে একেবারে গদ-গদ হয়ে বলে আ—হা !'

পুতুলের নাম টুটুল

বুকুর কুকুর আর সুতুর পুতুল—পুতুলের নাম টুটুল, কুকুরের নাম ঝুমুর।

ঝুমুরের ঝাঁকড়া সাদা লোম, গলায় লাল কলার, তাতে ঘুঙুর ঝোলানো—ঝুমুর যখন লাফালাফি ছুটোছুটি খেলা করে, ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঘুঙুর বাজে।

টুটুলের নীল চোখ, সোনালি চুল, সুতুর যত রকম জামা আছে, টুটুলের জন্যও ঠিক সেইরকম জামা মা সেলাই করে দিয়েছেন—রোজ টুটুল সুতুর সঙ্গে 'ম্যাচ' করা পোশাক পরে চুলে রিবন বাঁধে।

বুকু ঝুমুরকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে, ছোট্ট ব্রাশ দিয়ে বুরুশ করে দেয়, তাই ঝুমুরের ঝাঁকড়া লোম রেশমের মত নরম আর চক্‌চকে হয়েছে।

সুতুও রোজ টুটুলকে কষে সাবান ঘষে স্নান করিয়ে, তোয়ালে দিয়ে জোরে রগড়িয়ে মোছে, ছোট্ট চিরুনী দিয়ে টেনে টেনে চুল আঁচড়িয়ে দেয়। জোরে দিতে মানা করলে, বলে 'কত ময়লা জমেছে—ভাল করে সাফা করতে হবে তো ? চুলে জট পড়েছে, ছাড়িয়ে দিতে হ'বে না ?' সুতুর যত্নের চোটে টুটুলের লাল ঠোঁট আর গোলাপি গাল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ভুরু মুছে যাচ্ছে, চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথায় টাক পড়ল বলে। তবু সুতু বলে 'দাদার ঝুমুরের চেয়ে আমার টুটুল ঢের—ঢের বেশি সুন্দর !'

বুকু বলে 'আমার ঝুমুর সত্যি জ্যান্ত কুকুর—কেমন খেলা করে, ডাকলে কাছে আসে, ভৌ-ভৌ কুঁইকুঁই করে ; সুতুর টুটুল তো একটা পুতুল—কিছুই করতে পারে না।' সুতু টুটুলের হাত পা ধরে 'তাই তাই' 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করিয়ে বলে 'এই তো টুটুলও জ্যান্ত—এখন ছোট্ট আছে কিনা বড় হলে সব পারবে।' 'হুঁ বড় আর হয়েছে ! দাদু যখন দিলেন তখন ঝুমুর আর টুটুল সমান সাইজ ছিল, এখন ঝুমুর ডবল বড় হয়ে গেল আর টুটুল তো যেমন-কে-তেমনটি রয়েছে !' সুতু রেগে কেঁদে ফেলে—দাদা কিছু জানে না, কিছু বোঝে না—সুতু যেমন মায়ের খুকু, টুটুল ঠিক তেমনিই সুতুর খুকু।

ঝুমুরের একটা দোষ, টুটুলকে সে ভারি হিংসা করে—ঝুমুরকে গলায় শিকলি বেঁধে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, টুটুল কেন কোলে চড়ে বেড়ায় ? ঝুমুর খাবার টেবলে উঠতে পায় না, টুটুল কেন টেবলে বসে খায় ? টুটুলের আদর দেখে এমন রাগ ধরে—ইচ্ছা হয়, 'দিই কামড়ে কুটুস করে।'

সেদিন দুপুরে টুটুলকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সুতু মায়ের সঙ্গে মাসিমার বাড়ি বেড়াতে গেল। বুকু বিকালে ঝুমুরকে বেঁধে রেখে খেলতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে ঝুমুর কলার ছিঁড়ে কোথায় পালিয়েছে ! খুঁজতে খুঁজতে বাগানে গিয়ে দেখল, টুটুলকে মাটিতে ফেলে, সামনের দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরে, ঝুমুর তার একটা পা চিবোচ্ছে—যেমন করে

সে হাড্ডি চিবোয় ! বুকুকে দেখেই, টুটুলকে মুখে নিয়ে দে ছুট ! অনেক ছুটোছুটি করে বুকু টুটুলের পা দুটো ধরে ফেলল, ঝুমুর মুণ্ডুটা কামড়ে রইল—চলল ভীষণ 'টাগ-অভ-ওয়ার' ।

টানের চোটে পটাং করে ছিঁড়ল কোথায় তারের বাঁধন—টুটুলের হাত-পা গা-মাথা সব আলগা হয়ে—মাথার চুল উপড়ে মুখে নিয়ে ঝুমুর পালাল, গাটা মাটিতে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, একটা চোখ খসে ভিতরে ঢুকে গেল ।

মহা বিপদ ! এখন, উপায় কি ! সুতু এসেই তো বিষম কান্নাকাটি করবে । বুকু ছুটে বাবার কাছে গেল । বাবা তাকে নিয়ে দোকানে গেলেন, অনেক খুঁজে টুটুলের মত দেখতে একটা পুতুল আর ঝুমুরের জন্য মজবুত একটা কলার কিনে দিলেন । নতুন পুতুলকে টুটুলের বিছানায় শুইয়ে রেখে ঝুমুরকে ধরে বেশ পিট্টি দিয়ে বেঁধে রাখল বুকু ।

একটু পরেই সুতুকে নিয়ে মা ফিরলেন । সুতু ছুটে বিছানার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'এটা আবার কে ? টুটুল কোথায় ? আমার টুটুল ?' কিছুতেই তাকে ভোলাতে না পেরে, বুকু ভাঙা-চোরা কাদামাখা টুটুলকে এনে দেখালো ; মা বললেন, 'ওটা বিচ্ছিরি নোংরা হয়ে গেছে—ওটা থাক্, তুমি এই নতুনটাই নাও ।' দারুণ অভিমানে সুতু বলল, 'আমার যদি হাত-পা ভেঙে যেতো, চোখ কানা হয়ে যেতো, আমাকে কি তুমি ফেলে দিতে ? বলতে বি-চ—' আর বলতে পারল না, মাটিতে পড়ে টুটুলকে জড়িয়ে ধরে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল ।

'না মা-মণি, তাও কি কখনো হয় ? সবচেয়ে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে, যেমন করে পারি তোমাকে আমরা ভাল করে তুলতাম ।'

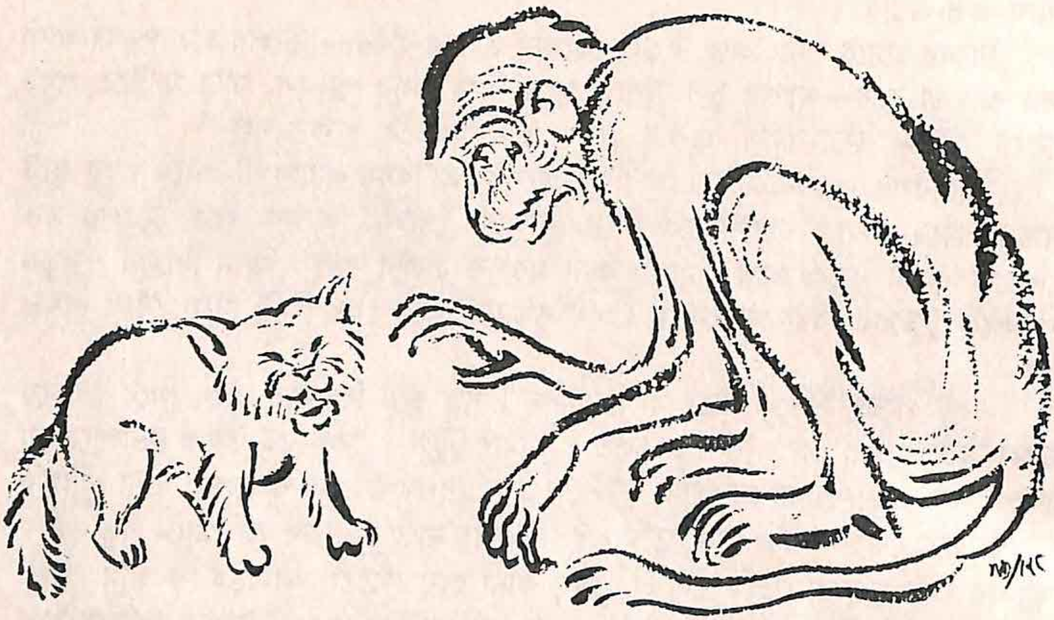
'তবে টুটুলকে কেন ডাক্তার দেখাচ্ছ না ?'

হঠাৎ মায়ের মনে পড়ে গেল কণিকাদিদির কথা—কণিকাদি চমৎকার পুতুল বানাতে পারেন । বললেন 'কেঁদো না সুতু, আমি এখনি টুটুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি ।' টুটুলকে ধুয়ে মুছে তোয়ালে মুড়ে মা কণিকাদির কাছে নিয়ে গেলেন ।

কণিকাদি কাপড়ের ভিতর তুলো আর তার ভরে টুটুলের নতুন গা তৈরী করে তাতে ওর হাত-পা-মাথা জুড়ে দিলেন, আঠা দিয়ে চোখটা আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেন ; রং তুলি দিয়ে লাল ঠোঁট, গোলাপি নাক, বাঁকা ভুরু এঁকে দিলেন ; রেশমি সুতো দিয়ে সোনালি চুল বানিয়ে দিলেন । আবার ঠিক যেন সেই নতুন টুটুলের মতই হয়ে গেল !

টুটুলকে ফিরে পেয়ে সুতুর মুখে হাসি আর ধরে না ! টুটুলকে কোলো নিয়ে কত যে আদর করল, সারা বাড়িময় নেচে বেড়াল, মাকে অনেক চুমু খেল, তারপর বুকুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দাদামণি, নতুন পুতুলটাও খু-উ-ব ভাল ! তরশু তো বেলাদির জন্মদিন, মাসিমা নেমন্তন্ন করেছেন । ওটা তুমি বেলাদিকে দিয়ো, কেমন ?'

বাঁদর মা



বিশাল একটা বটগাছ অনেক ডালপালা মেলে দিয়ে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে—তার ঘন সবুজ পাতার নীচে চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া।

পথ চলতে চলতে রোদে তেতে-পুড়ে কত পথিক সেই শীতল ছায়ায় বসে জিরিয়ে, গাটা জুড়িয়ে নেয়। দুপুর রোদে রাখাল ছেলেরা সেই ছায়ায় এসে খেলা করে, বাঁশি বাজায়, গান গায় ; গাছের ডাল থেকে লম্বা লম্বা শিকড় নীচে ঝুলে রয়েছে, সেই 'ঝুরি' ধরে তারা দোল খায়।

ডালে ডালে; কোটরে কোটরে, কত পাখি আর কাঠবিড়ালের বাসা—লাল টুকটুকে পাকা বটফল খেতে তারা খুব ভালবাসে।

একদল বাঁদরও রোজ সেখানে আসে। দুই হাতে মুঠো মুঠো বটফল পটাপট ছিঁড়ে টপাটপ মুখে পুরে দেয়, তারপর হুপ্ হুপ্ করে। ছেলের দল নীচে থেকে মজা দেখে।

মাঝে মাঝে ছেলেরা লাঠি নিয়ে কিম্বা ঢিল ছুঁড়ে বাঁদর তাড়া করে—বাঁদররা অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে তাদের গায়ে বটফল ছুঁড়ে মারে আর মুখ ভেংচায়।

একটা বাঁদরের কোলে ছোট একটা ছানা ! একহাতে ছানাটাকে বুকে চেপে ধরে, অন্যহাতে গাছের ডাল ধরে সে লাফিয়ে বেড়ায়—ছানাটাও দুই হাতে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। ছেলেদের ভারি ইচ্ছা হয়, কাছে গিয়ে ছানাটাকে ভাল করে দেখতে কিন্তু হাজার ডাকলেও বাঁদর-মা কাছে আসে না।

হঠাৎ একদিন কি অসুখ হয়ে ছানাটা মরে গেল। মা বাঁদরটা আর আসে না, খায়না-দায়না, দিনরাত খালি কাঁদে আর ছানাকে খোঁজে। একদিন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমের ঘোরে মনে হল যেন কাছেই কোথাও ছানাটা ডাকছে। চম্‌কিয়ে জেগে উঠে চারিদিকে তাকাল—ঐযে ওখানে ঘাসের মধ্যে কি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে—ওটা কি ? ছুটে কাছে গিয়ে দেখল, তার ছানা নয়, ছোট্ট একটা বেড়ালছানা। বোধ হয় সেটার মা মরে কিম্বা হারিয়ে গিয়েছে, তাই একলা কেঁদে বেড়াচ্ছে।

দেখে ভারি মায়া হ'ল, বাঁদরটা আস্তে আস্তে সেটাকে কোলে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বাঁদরের কোলে এসে বেড়ালছানার খুব আরাম লাগল—ঠিক যেন তার মায়ের কোলের মতই নরম আর গরম ! কান্না থামিয়ে, সে কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

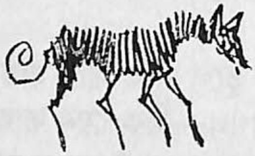
বাঁদরেরও খুব ভাল লাগল—ছানাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

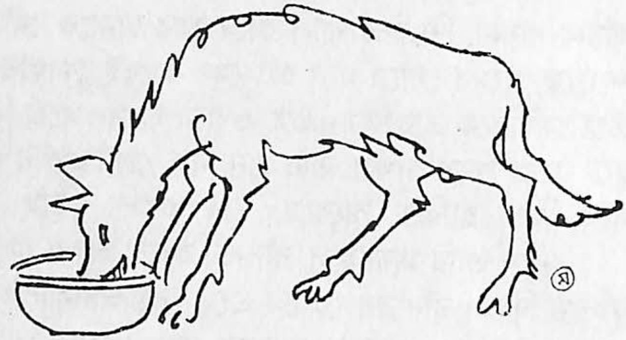
এরপর আর সে বেড়ালছানাকে ছাড়ল না, ছানাটাও তাকে ছাড়ল না, দুজনে খুব ভাব হয়ে গেল।

ছানাটাকে নিয়ে বাঁদর তার দলের কাছে ফিরে গেল কিন্তু দলের বাঁদরগুলো বেড়ালছানা দেখেই বেজায় কিচির মিচির করে উঠল। পাছে তারা ছানাটাকে মারে সেই ভয়ে বাঁদর দল থেকে একটু দূরে দূরে রইল, তবু সে ছানাটাকে ছাড়ল না—নিজের ছানার মতই তাকে বুকে নিয়ে বেড়ায়, দুধ খাওয়ায়, আদর করে।

এমনি করে মা-হারা বেড়ালছানা একটা বাঁদর-মা পেয়ে গেল, আর ছানাহারা বাঁদর-মা পেয়ে গেল একটা বেড়ালছানা।







রাজা ও রানী

'রাজা' হ'ল কুকুরের রাজা—যেমন জাঁদরেল চেহারা, তেমনি তার তেজ ! মনটাও তার দয়ালু—কখনও পাখি মারে না, পোষা বেড়ালটা বিরক্ত করলে, আ-স্তে থাপ্পড় মারে।

রাজা যখন মাংসভাত খায়, রোগা লোমঝরা একটা হ্যাংলা কুকুর দূর থেকে দেখে লেজ নাড়ে। রোজ একপা দুপা এগিয়ে, একদিন কুকুরটা কাছে এল, রাজার পাতের ভাত খেল—রাজা কিছুই বলল না। সেই থেকে কুকুরটা এ বাড়িতেই রয়ে গেল। ভাল খাবার আর যত্ন পেয়ে, সে বেশ সুন্দর হয়ে উঠল। তার নাম রাখা হ'ল "রানী"।

রাজা রানী দুজনে পাহারা দেয়,বাড়িতে চোর আসতে পারে না, বাগানে গরু ছাগল ঢুকতে পায় না। একদিন একটা গো-সাপ বাগানে ঢুকে পড়ল—কুকুরের তাড়া খেয়ে, সেটা ছুটে গিয়ে পাশের নালার জলে ঝাঁপ দিল!

অমনি দুই কুকুর নালার দুই ধারে গিয়ে দাঁড়াল—গোসাপ সাঁতরিয়ে যেই ওপারে উঠতে যায়, অমনি রানী তাকে তাড়া করে, আবার সাঁতরিয়ে এপারে এলেই, রাজা তাকে তেড়ে যায়! সাঁতার কেটে কেটে বেচারা যখন কাহিল হয়ে পড়ল তখন ওরা দয়া করে তাকে ছেড়ে দিল।

গোসাপ তীরে উঠেই চার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল,খানিক দম নিয়ে, তারপর সুড়সুড় করে পালাল।



দিদি

সকালে পড়া সেরে মিনু স্নান করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল খোকন তার বইখাতার উপরে ঝুঁকে কি যেন করছে।

একগাল হেসে খোকন বলল 'দিদি, তি-থি' (চিঠি)। মিনুর খাতা ভরে লাল নীল পেন্সিলের হিজিবিজি আঁকা। দেখেই সে একেবারে হাঁউমাউ ক'রে উঠল—'ও মাগো দেখো এসে খোকন কি করল, আমার এত কষ্ট করে লেখা সব নষ্ট করে দিল।'

রেগে চেঁচিয়ে, খোকনকে ঠাস করে এক চড় মারবার জন্য হাতটা উঁচিয়ে মিনু তেড়ে গেল—'খোকন তুই ভী-ষ-ণ—' বলতে যাচ্ছিল 'দুষ্টু' কিন্তু খোকনের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

কচিকচি দুধে দাঁত বের করে খোকন হাসছিল—দুইগালে ছোট দুটি টোল, চোখ দুটি উজ্জ্বল। ভাবছিল বুঝি ভারি বাহাদুরী করেছে, দিদি খুব খুসি হবে। কিন্তু, একি হ'ল ? দিদি কেন রেগে গেল ! বেচারা কিছুই বুঝতে পারছে না—মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেছে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে, চোখ দুটি ছল-ছল।

ছোট্ট দিদি তাড়াতাড়ি ছোট ভাইটিকে কোলে তুলে নিল, চাঁটির বদলে দুই গালে চুমু খেয়ে বলল 'খোকন, তুই ভী-ষ-ণ মিষ্টু !'

রাত দুপুরে

খোকাখুকুরা মায়ের কাছে ঘুমিয়ে আছে আরাম করে,
কেউ জানে না ঘট্‌ছে কি যে রাতদুপুরে পুতুল ঘরে—
চাঁদের আলো ঝল্‌মলিয়ে ঢুকল সেথা জান্‌লা দিয়ে,
ঘুমিয়ে ছিল পুতুলগুলো—দিল তাদের ঘুম ভাঙিয়ে।
জেগে সবাই বলল 'আহা ! এমন খাসা চাঁদ্‌নী রাতে
নাচের গানের ছন্দে তালে আনন্দে মন আপনি মাতে।'
মোমের পুতুল 'মনিমালা', মুখখানি তার হাসি হাসি,
কাজলটানা ডাগর দু চোখ, কোঁক্‌ড়া কালো কেশের রাশি,
বলছে 'ওগো মলি দিদি, দেখছ কেমন করেছি সাজ ?
বাজিয়ে নূপুর ঝুনু ঝুনু 'ময়ূর নাচ' নাচব আজ।'
'মলি' হ'ল ডলিপুতুল নীল দুটি চোখ, সোনালী চুল,
আকাশ-নীল পোশাক তার, মুখটি যেন গোলাপ ফুল !
নাচছে 'নীল-পরীর নাচ' হালকা যেন হাওয়ায় হেলে,
ফুরফুরে নীল প্রজাপতি উড়ছে যেন পাখ্‌না মেলে।
'কাঠপুতুলী' 'রূপকুমারী' রূপের ভারি গরব তার,
দেখিয়ে দিল এঁকেবেঁকে 'সাপের নাচ' কি চমৎকার !
নাদুস নুদুস ভালুক ছানা লোমের পুতুল 'টেডী' যে,
থপ্‌থপিয়ে 'ভালুক নাচন' নাচতে সদাই 'রেডী' সে !
তুরকী ঘোড়া 'চর্‌কি নাচ' নাচছে কেমন ঘুরে ঘুরে,
গিট্‌কিরি গান গাইছে কেমন 'চিঁ-হি-হি-হি' মিহিসুরে।
ভেবেই আকুল মাটির পুতুল গোলগাল সে আল্লাদী
'গানটা নাহয় গাইতে পারি, ক্যাম্‌নে নাচের পাল্লা দি' ?
বলল হাতি 'আমি তো দিদি অনেক মোটা তোমার চেয়ে,
তবুও দেখো, নাচবো খাসা শুঁড় দুলিয়ে গানটি গেয়ে।'
সবাই বলে 'নাচতে পারো যত তোমরা প্রাণটা চায়,
দোহাই দাদা ! গান গেয়ো না—ফাটবে যেগো কানটা তায় !'
এম্‌নি ধারা মজার পালা চলল সারা রাতটি জুড়ে'
নাচল তারা নানান ছাঁদে, গাইল তারা নানান সুরে
থামল তারা চাঁদামামা ডুবল যখন শেষের রাতে
চোখটি বুজে পড়ল শুয়ে যে যার আপন বিছানাতে।



কাকুর কুমীর

কাকু গেলেন, হাঁস শিকারে—নিয়ে এলেন, জ্যান্ত একটা কুমীরছানা ! উঠোনের চৌবাচ্চায় তাকে রাখলেন—নাম দিলেন 'জগ্‌মোহন ।'

জগ্‌মোহন প্রকাণ্ড হাঁ করে, কাকু টপাটপ্‌ খাবার দেন, সে কপাকপ্‌ গিলে খায়—বাব্‌লু টুব্‌লু মজা দেখে ।

এখন জগ্‌মোহন বেশ বড় হয়েছে—চৌবাচ্চায় কৈমাছ, উঠোনে শালিক চড়াই শিকার করে ! হঠাৎ একদিন সে কেমন করে রাস্তায় পালিয়ে গেল !

তারপর যা কাণ্ড—হাঁউমাউ করে ছেলেপিলেরা ছুটল, ঘেউঘেউ করে কুকুর ডেকে উঠল, দুমদাম করে দরজায় খিল পড়ল, 'মার্‌মার' করে কেউ কেউ লাঠি হাতে বেরিয়ে এল—যেই জগ্‌মোহন খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করে তেড়ে গেল, অমনি তারা হুড়মুড়িয়ে পালাল !

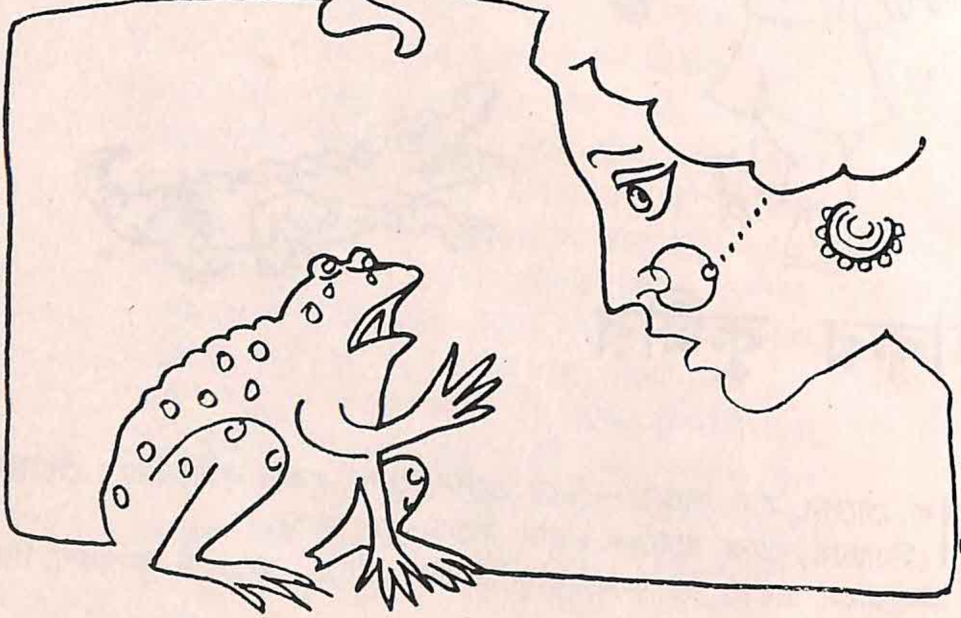
এবার এল, দরোয়ান ভীম সিং—মুগুরটা ধাঁ-ই করে মারবে, এমন সময়ে কাকু ছুটে এলেন 'মেরো না! মেরো না! আমার পোষা কুমীর !'

একটা কৈমাছ জগ্‌মোহনের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে কাকু ছুটলেন—সুড়সুড় করে জগ্‌মোহন তাঁর পিছনে চলল ।

পাড়ার লোকে বলল—'কি বিদ্‌ঘুটে শখ বাপু ! কুমীর আবার কেউ পোষে নাকি ? না মশাই, ওটাকে বিদায় করুন—কোনদিন কাকে কামড়াবে !' বাবাও বললেন, 'ওকে নাহয় আলিপুর চিড়িয়াখানায় দিয়ে এসো !'

কাকু বেচারা এখন প্রতি রবিবার চিড়িয়াখানায় যান—বোতলভরা কৈমাছ নিয়ে, তাঁর সাধের জগ্‌মোহনকে খাইয়ে আসেন ।

সাত বৌ



এক সওদাগরের নয়টি বৌ ! ছোট বৌ 'রাধা' সবচেয়ে সুন্দর, তাই অন্যরা তাকে হিংসা করে। শুধু বড়বৌ 'তারা' রাধাকে খুব ভালবাসে।

সওদাগর বিদেশে গিয়েছে, তারা দু দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেল, সেই সুযোগে হিংসুটি সাত বৌ করল কি, ডাইনি বুড়ির কাছে যাদু শিখে এসে, রাধাকে কোলাব্যাঙ বানিয়ে দিল—তারপর তাকে ঝাঁটা মেরে দূর ! দূর ! করে তাড়িয়ে দিল !

বড়বৌ ফিরে এসে বলল, 'রাধা কোথায় ?'

সাতবৌ বলল, 'আমরা কি জানি !' রাধাকে খুঁজতে খুঁজতে বড়বৌ পুকুরধারে গেল।

থপ্ থপ্ করে একটা কোলাব্যাঙ তার কাছে এল। ব্যাঙটার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, গলা ফুলিয়ে কুঁক্-কুঁক্ করে সে বললে—

'দিদি গো দিদি—কুঁক্-কুঁক্—তারা কুঁক্-কুঁক্—সাতজায়ে—কুঁক্-কুঁক্—যুক্তি কইর‍্যা—কুঁক্-কুঁক্—আমারে দিছে—কুঁক্-কুঁক্—ব্যাঙ বানাইয়া—কুঁক্-কুঁক্ !'

তারা তখনি ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে এল। সাতবৌকে বলল, 'ভাল চাস তো এখনি

ওকে আবার মানুষ বানিয়ে দে ! নইলে কর্তা বাড়ি এসে তোদের—'

দুষ্টুমি ধরা পড়ে গিয়েছে দেখে সাতবৌ ভয়ে ভয়ে বলল, 'না গো দিদি ! কাউকে কিছু বলো না—আমরা আর কখনও এমন কাজ করবো না !' তখনি ওরা যাদু দিয়ে আবার রাধাকে ছোটবৌ করে দিল।

(পূর্ব বাংলার পুরানো গল্প)

"পিঠা পরব"

গোলগাল হাসিখুসি ছেলেটি, নাম তার রামভজন, সবাই ভজুয়া বলে ডাকে আর দাদাবাবুরা বলে 'রামভোজন'—সে কিনা খুব খেতে ভালবাসে, তাই।

তা, আজ বিকালে ভোজটা খুব ভালই ছিল ; বাবুদের বাড়িতে আজ ছিল 'পিঠা পরব', কত রকমের যে পিঠা আর লাড্ডু, মালপোয়া, পাটিসাপ্‌টা, রসবড়া, গোকুলপিঠা, গঙ্গাজলি, পুলিপিঠা, চন্দ্রপুলি, নারিকেল নাড়ু, তার উপর আবার নতুন গুড়ের পায়স আর কড়াইসুঁটির কচুরি—এসব সে আগে কখনো খায়নি, চোখে দেখেনি, নামও শোনেনি ! দেখেই তার মনটা নেচে উঠেছিল, কিন্তু প্রাণভরে পেটপুরে সে খেতে পারেনি। সবাই তার খাওয়া দেখছিল, কেউ কেউ হাসছিল, তাই ভারি লজ্জা করছিল।

'মা-জী' ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন ; মস্ত একটা ঠোঙায় ভরে অনেক খাবার তার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর তো কিছুই খাওয়া হল না ভজুয়া ! এই নে, বাড়ি গিয়ে ভাল করে খাস্ !' ঠোঙাটা দুই হাতে বুকে চেপে ধরে খুসি মনে বাড়ি চলল ভজুয়া।

বেরিয়েই দেখে, ঐরে ! ভোঁদা আর পচা এদিকে আসছে—ওরা অনেক বড় আর গায়ে ভীষণ জোর—খাবার দেখলেই কেড়ে নেবে ! তাড়াতাড়ি সে ছুটে পালাল। একটু দূরে গিয়েই আবার সামনে এল বিম্‌লি—ভারি হিংসুটি হ্যাংলা আর ঝগড়াটে, মিছিমিছি মারে আর গালাগালি দেয়। এখন কিন্তু বিম্‌লি ভাব দেখিয়ে গদ গদ হয়ে বলল, 'ঠোঙায় কি আছেরে ভজু ? খাবার ? একটু দে না ভাই।' ছোট একটা কচুরি আরো ছোট্ট

একটা নাড়ু তার হাতে দিয়েই ভজুয়া আবার ছুটল। যেতে যেতে ভাবছে বাড়ি গিয়েই কেমন মজা করে খাবে। দাদীকেও একটু দেবে, বুড়ী মানুষ বেশী তো খেতে পারে না, বাকি সবটাই পেট ভরে খাবে, আজও খাবে কালও খাবে।

বাড়ির কাছেই, হাবুল আর কাবুল তাদের ছোট বোন পুতুলকে কোলে নিয়ে বসে আছে। ওদের মা এখনও কাজ থেকে ফেরেনি, পুতুলের ভীষণ খিদে পেয়েছে, সে মা মা করে কাঁদছে, কিছুতেই ওরা তাকে ভোলাতে পারছে না—কাবুলেরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘরে চাল নেই বলে মা আজ ভাত রাঁধেনি, সকালে একমুঠো মুড়ি ছাড়া সারাদিন কিছুই খায়নি ওরা বলতে বলতে হাবুলেরও চোখে জল এসে গেল। ঠোঙা থেকে কিছু খাবার বের করে দিতেই, তিন ভাইবোনে কি যে খুসি। টপাটপ মুখে পুরল, দেখে ভজুয়ার খুব ভাল লাগল, সে আরো দিল। কোথা থেকে আরো দুটো ছোট রোগা ছেলে এসে দাঁড়াল, তাদেরও দিল। ওরা যত খুসি হয়ে খেয়ে চলেছে, ভজুয়ার মনটাও ততই খুসিতে ভরে উঠছে, সে আরো দিয়ে চলেছে। ভোজ খেতে ভারি মজা কিন্তু ভোজ খাওয়াতে যে এত মজা তা তো সে আগে জানতো না!

সব দিয়ে, শুধু খানিকটা পায়স বাকি রেখেছিল, বাড়ি গিয়ে সেটুকু তার বুড়ী দাদীকে দিল। দাদী মহাখুসি হয়ে বলল, 'তুই আধা খা আমি আধা খাই।' ভজুয়া বলল, 'না দাদী, আমি ভরপুর খেয়েছি।' দাদী সবটুকু পায়স চেটেপুটে খেল। ভজুয়ার মনে হল সে যত ভোজ খেয়েছে আজকের পিঠা পরবের ভোজটাই সব চেয়ে ভাল।



বেবী কোথায় ?



পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ বাড়ির বেবী আর ও বাড়ির বেলা দুজনে খুব ভাব। রোজ সকালে বেবী বেলাদিদির বাড়িতে খেলতে যায়। বেলার অনেক পুতুল, আর মস্ত একটা পুতুল-বাড়ি। দশটা বাজলে বেলা স্কুলে চলে যায়, বেবীও বাড়ি ফিরে আসে।

বেলার সুন্দর একটা নতুন পুতুল এসেছে, চোখ বোজে চোখ খোলে, আবার মা বলতে পারে! সময় হলে, বেলা স্কুলে গেল। বেবীও বাড়ি রওনা হল।

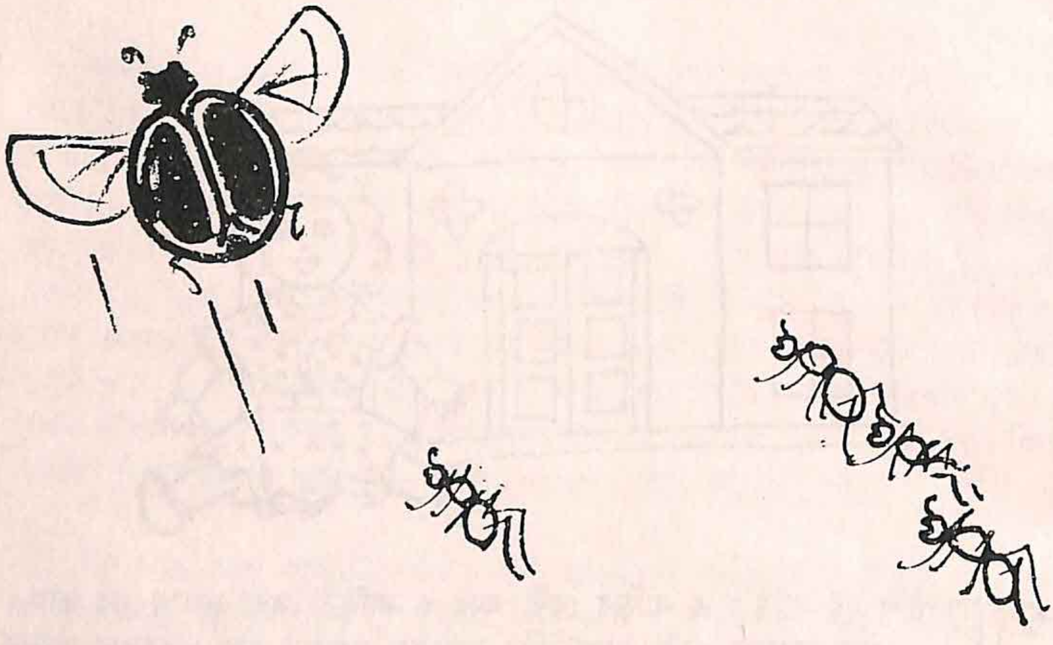
অনেক পরে বেবীদের ঝি তাকে ডাকতে এল। বেলাদের আয়া বলল—'বেবী ত কখ…ন চলে গেছে!'

বেবী বাড়িতে যায়নি, বেলাদের বাড়িতেও নাই, তাহলে সে কোথায় গেল? রাস্তায় চলে গেল না ত? বাড়ির পিছনে পুকুর, বাগানে কুয়ো আছে। পড়ে গেল না ত? বেবীর বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরোলেন, দু বাড়ির লোক মিলে কত খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি, বেবী কোথাও নাই। মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে, সকলের ভীষণ মন খারাপ।

হঠাৎ আয়া চেঁচিয়ে উঠল—'এই যে, বেবী এইখানে!' পুতুল-ঘরটার ভিতরে ঢুকে গিয়ে, নতুন পুতুলটাকে বুকে নিয়ে বেবী গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে! বাড়ি যেতে যেতে কখন সে-যে পুতুলের লোভে ফিরে এসেছিল কেউ জানে না!

মা ছুটে গিয়ে বেবীকে কোলে নিলেন, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বেবী বলল—'ওমা! আমাকে জন্মদিনে এমনি একটা পুতুল কিনে দেবে মা?'

গুব্‌রে আর পিঁপড়ে



বন্‌বন্‌ করে বিজলীপাখা ঘুরছে, ভন্‌ভন্‌ করে একটা গুব্‌রে পোকা উড়ছে। হঠাৎ ঠকাস্‌ করে পাখার ঠোকর লাগল, ধপাস্‌ করে পোকাটা মাটিতে পড়ল।

মাথাটা ঝন্‌ঝন্‌ করছে, পিঠটা টন্‌টন্‌ করছে, চিৎপাত হয়ে গুব্‌রেপোকা শুধু পা ছুঁড়ছে আর শুঁড় নাড়ছে—কিছুতেই সোজা হতে পারছে না।

দুটো পিঁপড়ে সেখানে ঘুরছিল, ছুটে গিয়ে বাসায় খবর দিল—অমনি একদল পিঁপড়ে এসে হাজির।

ছয়টা মোটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে গুবরের ছয় পা কামড়িয়ে ধরল, দুজনে দুটো শুঁড় ধরল, আর যে যেখানে পারে কাঁধ লাগাল, তারপর—"মারো ঠেলা, হেঁইয়ো!"—ঠেলতে ঠেলতে বেচারাকে ওরা বাসায় নিয়ে চলল।

অসহায় গুবরেকে দেখে রানুমিনুর দুঃখ হ'ল, দুটো কাঠি নিয়ে দুইবোনে পিঁপড়ে ছাড়াতে বসল। সহজে কি ছাড়ে? অনেক কষ্টে সবগুলো ছাড়ান হলে, পোকাটা কাঠি আঁকড়িয়ে সোজা হয়ে বসল।

পিঁপড়েরা ভীষণ রেগেছে, কিছুতেই ছাড়বে না—আবার তখনি তারা গুবরেকে ঘিরে ফেলল—এই বুঝি ধরল!

হঠাৎ গুবরের পিঠের খোলাটা দু-ফাঁক হল, ভিতর থেকে একজোড়া ডানা বেরোল—ফু-ড়ু-ৎ করে সে উঠে পালাল—পিঁপড়েরা হাঁ করে চেয়ে রইল।



স্যাণ্টা ক্লস

নোটন—'জানো দাদু, কাল ত বড়দিন। আজ রাতে নেলী আর টমি ওদের মোজাগুলো খাটে ঝুলিয়ে রাখবে আর স্যাণ্টা ক্লস এসে তাতে খেলনা, পুতুল, টফি-চকোলেট ভরে দিয়ে যাবে!'

ছোটন—'স্যাণ্টা কেন আমাদের বাড়ি আসে না দাদু? আমাদের খেলনা দেয় না কেন?'

দাদু—'কেন আসবে? তোমরা ত তাকে ডাকো না, মোজা ঝুলিয়ে রাখ না ত?'

সে রাতে নোটন-ছোটন তাদের মোজা ঝুলিয়ে রাখল, 'স্যাণ্টা আসবে ত?'—ভাবতে ভাবতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে চমকিয়ে উঠল—এসেছে! এসেছে!! মিটমিটে আলোয় দেখল ঠিক যেমন বইয়ে ছবি থাকে—লাল পোশাক, সাদা দাড়িগোঁফ, গোলগাল বুড়ো মোজার মধ্যে কি ভরছে!

অবাক হয়ে ওরা দেখছে, হঠাৎ 'হ্যাঁ—চ্চো! হ্যাঁ—চ্চো! ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ!'

আরে! এ-হাঁচি যে খুব চেনা হাঁচি! তড়াক করে উঠে দুজনে স্যাণ্টাকে ধরে ফেলল, একটানে উড়ে গেল লাল-টুপি আর সাদা দাড়িগোঁফ, বেরিয়ে পড়ল দাদুর টাকমাথা আর ফোকলা মুখ! তখন কেবল হা-হা-হা-হা-হা, হো-হো-হো-হো-হো, হি-হি-হি-হি-হি! মা বললেন—'দেখেছ, দাদু তোমাদের কত ভালবাসেন! বুড়োমানুষ, এই শীতে কোথায় লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোবেন, তা-নয় তোমাদের খুসি করার জন্য এত কাণ্ড করেছেন! আপনাকে এক কাপ গরম চা দেব বাবা? ঠাণ্ডা লেগেছে নিশ্চয়—'

'ঠাণ্ডা নয় মা, ফ্যাঁচ! ঐ তুলোর গোঁফের সুড়সুড়িতে—হ্যাঁচ্চো!!'

ছোট্ট দাদা ছোট্ট বোনটি

দুই বছরের ছোট্ট ছেলে ইন্দ্রনীল, দিল্লীতে তার বাবা-মায়ের কাছে থাকে—বাবা সেখানে কাজ করেন। ছুটিতে বাবা-মা তাকে নিয়ে কলকাতায় তার ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমায়ের কাছে এলেন।

কলকাতার বাড়িতে কত লোক—দুজন 'দাদু' দুজন 'ঠাম্মা' আছেন, ঠাম্মাদের মা, খুব বুড়ী 'বম্মা' (বড়মা) আছেন, তিনজন কাকা দুজন কাকিমা আছেন, আর আছে—বড় কাকার মেয়ে, দেড় বছরের ছোট্ট বোন 'তিমা'।

ইন্দ্রনীলের মজবুত গোলগাল গড়ন, ফর্সা রং, গালদুটি লাল, চোখদুটি উজ্জ্বল, ফিক্ করে হাসিটি ভারি মিষ্টি ! তিমার নরম তুলতুলে গড়ন, মাথাভরা রেশমী নরম কোঁকড়া চুল, রং একটু ফেকাসে, চোখদুটি যেমন সুন্দর, হাসিটি তেমনি মিষ্টি।

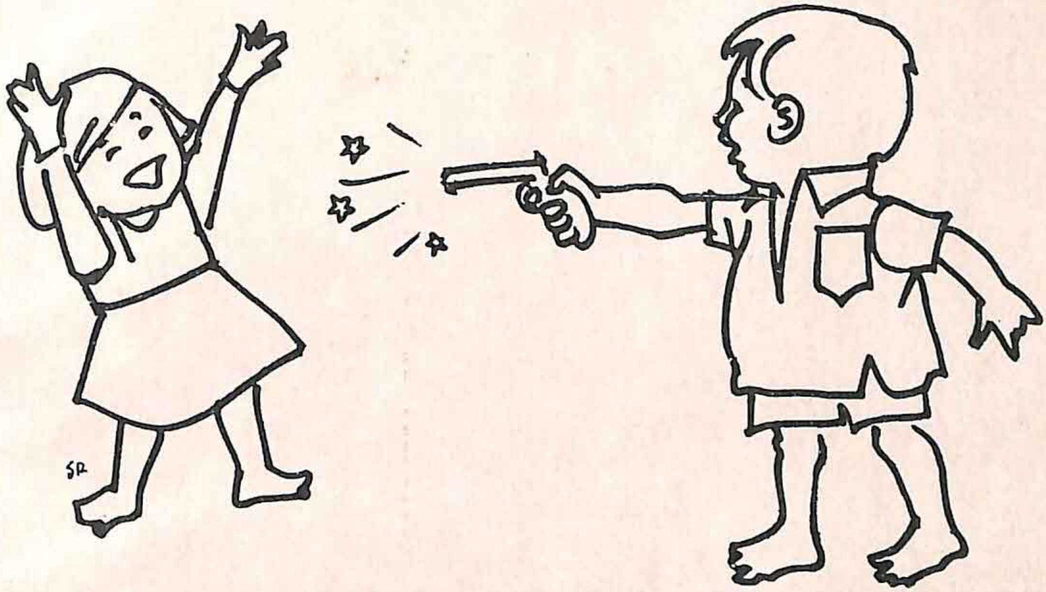
ইন্দ্রনীল কথা কম বলে, তাও হিন্দী আর ইংরাজি, 'গুডমর্নিং', 'নমস্তে', 'স্তপিত' (স্টপ ইট), 'স্তুপিদ' (স্টুপিড) এইসব। বড়মা চোখে ভাল দেখেন না, তাঁকে সে সাবধানে পথ দেখিয়ে সামনের বারান্দায় নিয়ে যায়—'ইধারসে আও, দেখ্‌কে চলো, নিচু হ্যায়'—এমনি করে। তিমা কলকল করে কত কথাই যে বলে ! দিল্লী-বিল্লী, কালি-বালি মুখের ভিতর গোলমাল ওলটপালট হয়ে যায় !

কত ওদের খেলার সাথী—তিনটা কুকুর 'কোকো', 'পিংকা', 'ছুটকি', দুটো হাঁস 'সিকান্দার' আর 'সালোমে', সুন্দর একটা সাদা-কালো বিড়াল 'কালিন্দী'। তাদের ওরা খুব ভালবাসে, তারাও ওদের খুব ভালবাসে। যে কেউ হেসে কথা বলে তার সাথেই ওদের ভাব হয়ে যায়।

ইন্দ্রনীল পালোয়ান ছেলে—খাটে মাথা ঠুকে কপালটা ফুলে আলুর মত হয়ে গেল, তবু কাঁদল না ; খালি বলল 'চোত্' (চোট্) আর খাটটাকে ঠাঁই ঠাঁই করে মেরে দিল। তিমা আদুরে মেয়ে, একটুতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। অত কান্না দাদা পছন্দ করে না—তিমাকে বলে 'চোপ'। তিমার মাকে বলে 'মালো !' (মারো !)

দুজনেই গানবাজনা খুব ভালবাসে—তালে তালে নাচে, দোলে, ব্যায়াম করে। ছুটোছুটি, লুকোচুরি, বল খেলা দুজনেই ভালবাসে, তবে ইন্দ্রনীল সবচেয়ে ভালবাসে ডাণ্ডা (লাঠি) আর বন্দুক—আর তিমা গিন্নীবান্নীর মত তার 'পুতু'দের চান করাতে, চামচে ভাত খাওয়াতে, বোতলে 'দু-দু' খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে ভালবাসে।

খেলার পিস্তল এনে দিতেই, ইন্দ্রনীল সোজা তিমার দিকে তাক্ করল—ফট্ ফট্ আওয়াজ হল, ধক ধক আগুন বেরোল—তিমা হেসে বলল 'বাজি' ! দেওয়ালীতে বাজি দেখে খুব ভাল লেগেছিল, তাই ভাবল এও বুঝি একটা বাজি। দুজনে খুব ভাব, তবে



মাঝে মাঝে একটু হাতাহাতি মারামারিও হয়ে যায়—আবার তখনই ভাব হয়ে যায়।

সারাদিন দুই ভাইবোনে কি মজাই যে করে! দাদু ঠাম্মা কাকা কাকিরা সবাই বেজায় কাজের লোক, ওরা হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মতন এসে তাঁদের কাজের জিনিস এলোমেলো করে দেয়, দরকারি কাগজে হিজিবিজি কাটে, চশমা কলম নিয়ে পালিয়ে যায়, তবু এমন মিষ্টি ছোট খোকাখুকুদের উপরে কি কেউ রাগ করতে পারে? ওদের দুষ্টুমিতে তাঁরা হেসে ফেলেন। কাজের চাপে মাথাটা যখন ভারি হয়ে ওঠে, ওরা মাথাটা হাল্কা করে, মনটা তাজা করে দেয়।

এমনি করে সারাবাড়িটা হাসিতে আনন্দে ভরিয়ে দিয়ে, ছুটির শেষে ইন্দ্রনীল বাবা মায়ের সাথে দিল্লীতে ফিরে গেল। সেখানে ছোট মেয়ে দেখলেই সে ডাকে 'তিমা'! তিমাও ছোট ছেলে বা ছেলের ছবি দেখলেই বলে 'দাদা'! 'দাদা কোথায় গেল?' বললে, আকাশ দেখিয়ে হাত ঘুরিয়ে বলে 'উয়ে গেছে—বোঁও কলে—পেন—দিল্লী!' তার মানে, 'উড়ে গেছে—বোঁ করে—প্লেনে চড়ে দিল্লীতে।'

—

খুব ছোট্ট যারা, সবে যারা অক্ষর চিনেছে, যাদের গল্পের খিদে অনন্ত—ঠিক তাদের উপযোগী গল্পের বই বেশী নেই। সেই অভাবই মেটাবে এই অসাধারণ গ্রন্থ।

ছোটদের জন্য লেখা কঠিন, ছোট্টদের জন্য কঠিনতর। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর কন্যা এবং সুকুমার রায়ের সহোদরা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর রক্তের মধ্যেই রয়েছে ছোটদের বশ করার এক ঐতিহ্যের বীজ। তাই বুঝি তিনি এমন কঠিনতর কাজ এমন নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করতে পেরেছেন।

এ-বইয়ের গল্পগুলি ছোট্ট, সহজ সরস, স্বাদু; তাদের কথা ভেবে লেখা, যারা সবে পড়তে শিখেছে, এমনভাবে লেখা যাতে তারা আরও ভালোভাবে পড়তে শিখে যাবে। ছোটদের নিজস্ব জগতের অধিবাসীরাই এ-বইয়ের নানান গল্পের নানান চরিত্র। হাঁস, মুরগী, কুকুর, বেড়াল, ব্যাঙ, ইঁদুরছানা, কাঠবেড়ালী, হরিণ, টিয়া—এমনতর সব্বাইকে নিয়ে দুরন্ত সব গল্প। হাসির, মজার, দুঃখের।

সেইসঙ্গে পাতায়-পাতায় চোখ-জুড়োনো ছবি। এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।